প্রতি মাসের
সুখবর
অমর একুশে সংখ্যা- ২০২০
The Monthly SHUKHOBOR

ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ
দুপুর বেলার অক্ত
বৃষ্টি নামে, বৃষ্টি কোথায় ?
বরকতের রক্ত।

হাজার যুগের সূর্যতাপে
জ্বলবে এমন লাল যে,
সেই লোহিতেই লাল হয়েছে
কৃষ্ণচূড়ার ডাল যে !

প্রভাতফেরীর মিছিল যাবে
ছড়াও ফুলের বন্যা
বিষাদগীতি গাইছে পথে
তিতুমীরের কন্যা।

চিনতে না কি সোনার ছেলে
ক্ষুদিরামকে চিনতে ?
রুদ্ধশ্বাসে প্রাণ দিলো যে
মুক্ত বাতাস কিনতে ?

পাহাড়তলীর মরণ চূড়ায়
ঝাঁপ দিল যে অগ্নি,
ফেব্রুয়ারির শোকের বসন
পরলো তারই ভগ্নী।

প্রভাতফেরী, প্রভাতফেরী
আমায় নেবে সঙ্গে,
বাংলা আমার বচন, আমি
জন্মেছি এই বঙ্গে।

একুশের কবিতা || আল মাহমুদ

shukhobor-february-2020.indd 1 2020-02-19 2:42 AM

OFFICE OF

BRAD BRADFORD

TORONTO

Toronto City Councillor
Beaches—East York | Ward 19

MAKING CITY HALL WORK FOR YOU

BE

bradbradford.ca

@BradMBradford

@BradBradford

@bradfordgrams

shukhobor-february-2020.indd 2 2020-02-19 2:42 AM

প্রতি মাসের
সুখবর

ISSUE # 05 | FEBRUARY- 2020

Chairman Of The Board
Syed Shamsul Alam

Editor In Chief
Tahsen Rashed Shaon

Publisher
Mahmuda Khan

Head Of Youth Comunication and English
Rafee Syed

Proof Reading
Fatma Bedur

Cover and Photography
Rashed Shaon

Art Direction and Graphics
Rashed Shaon

Head Of Advertising
Khokon Abbas

Head Of Marketing Solution
Sakil Choudhury

Bangladeshi and Multicultural Magazine.

The Monthly Shukhobor
2994 Danforth Ave. | Suite # 201
TORONTO, ON. M4C 1M7. CANADA

Phone# 647-717-9726| 306-502-3944

Email: info@shukhobor24.com | shukhobor24@gmail.com

Online Portal: shukhobor24.com

সম্পাদকীয়

বছর ঘুরে এবার এসেছে ফেব্রুয়ারি। এরই মধ্যে শীতের জড়তা ভেঙ্গে ফাল্গুনি হাওয়া বইছে বাংলাদেশে। আর ঢাকার বাংলা একাডেমি ও তার আশপাশের এলাকায় অমর একুশে গ্রন্থমেলাকে কেন্দ্র করে চলছে বই উৎসব। অন্যদিকে ঢাকা মেডিকেলের পাশে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার ও এর চত্বর ঘিরে প্রতিদিনই নানা সাংস্কৃতিক আয়োজন চলছে ভাষার জন্যে আত্ম বলিদানকারী জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের স্মরণ করে। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনে শহীদ ভাষাসৈনিকদের স্মরণ করতে দেশেই শুধু নয়, বিশ্বের যে প্রান্তেই বাঙালিরা আছেন সেখানেই চলছে নানা উদযাপন। কানাডায় টরন্টোর বাঙালি কমিউনিটিও এর বাইরে নয়।

শুধু একুশ ফেব্রুয়ারিতেই (আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস) নয়, প্রবাসীদের কাছে ভাষা দিবসের গুরুত্ব যেন সারা বছর জুড়েই। কেননা যারা নানা কারণে প্রবাসী হয়েছেন তাদের বুকের ভিতটাই যেন এক খণ্ড বাংলাদেশ আর তাদের অন্তরটা যেন বাংলার আলো-হাওয়ায় বিধৌত। তাইতো শিল্পমনা ও সংস্কৃতিক কর্মিরা প্রায় সারা বছর জুড়েই কোনো না কোনো আয়োজন মেতে থাকেন নানা উপলক্ষ ও আয়োজন ঘিরে।

টরন্টো থেকে প্রকাশিত কমিউনিটির প্রতি মাসের মুখপাত্র সুখবরও পিছিয়ে নেই এই দৌড়ে। নতুন আঙ্গিকে প্রকাশ হতে থাকা সুখবর ভাষার মাসকে উদযাপন করতে এবারের সংখ্যাটিকে উৎসর্গ করছে শহীদ ভাষা সৈনিকদের। সেই সঙ্গে সংখ্যাটিকে সাজানো হয়েছে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের নানা ঘটনা প্রবাহকে ঘিরে।

এবারের সংখ্যায় থাকছে ভাষা আন্দোলনের ঘটনা প্রবাহের চিত্র, ভাষার উৎপত্তি ও গুরুত্ব নিয়ে কয়েকটি রচনা। পাশাপাশি সমসাময়িক কবিদের ভাষা নিয়ে কবিতা।

গত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে কিছু মানুষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় টরন্টোর ড্যানফোর্থ এভিনিউয়ের 'বাংলা টাউন' খ্যাত এলাকার কেন্দ্রবিন্দু ঘরোয়া রেস্টুরেন্ট-এর পার্কিং লটে অস্থায়ী শহীদ মিনার তৈরি করে সেখানে দিনের প্রথম প্রহরে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতার যে রীতি রয়েছে তা নিয়ে বিশেষ আয়োজন থাকছে এবার।

স্থানীয় কমিউনিটির কিছু মানুষের উদ্যোগে শিগগিরি নির্মিত হতে যাচ্ছে একটি স্থায়ী শহীদ মিনার। এই উদ্যোগের অন্যতম সমন্বয়ক টরন্টো ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাংগুয়েজ মনুমেন্ট ডে ইনকর্পোরেশন (আইএমএলডি)-এর ডিরেক্টর রিজওয়ান রহমান এবং টরন্টো বিচেস ইস্ট-ইর্য়ক এলাকার কাউন্সিলর ব্র্যাড ব্র্যাডফোর্ড-এর বিশেষ দুটি সাক্ষাতকারও থাকছে এবারে। তাদের সাথে সুখবরের আলাপচারিতায় উঠে এসেছে বাঙালি কমিউনিটির ও মূল ধারার মধ্যে যে সংযোগ স্থাপন হয়েছে তার পূণাঙ্গ চিত্র। পাশাপাশি, টরন্টোতে একটি স্থায়ী শহীদ মিনার তৈরির যে স্বপ্ন এতদিন বাঙালিরা দেখে এসেছেন তা পূরণ হতে খুব যে বেশি দেরি নেই সেটিও পরিষ্কারভাবে প্রতিয়মান হয়েছে।

এছাড়া নিয়মিত বিভাগগুলোতো থাকছেই। বাড়তি পাওনা হিসেবে এবারেও রয়েছে বাংলাদেশি-কানাডিয়ান কমিউনিটির নতুন প্রজন্মের বেশ কয়েকজন তরুণতরুণীদের বাংলা ভাষা ও ভাষা আন্দোলন নিয়ে মতামত।

পরিশেষে বলতে চাই, সুখবর'র অগ্রযাত্রায় আপনাদের সমর্থনে ও ভালোবাসায় আমরা অভিভূত। আমাদের সকলের মিলিত পথচলা অব্যাহত থাকুক।

আপনারাও দেখতে থাকুন, পড়তে থাকুন, লিখতে থাকুন সুখবর-এ।

সকলকে ফাল্গুনের শুভেচ্ছা।

জয় হোক সকল শুভবোধের। জয়তু বিশ্বমানবতা। জয়তু সুখবর।

shukhobor-february-2020.indd 3 2020-02-19 2:42 AM

প্রতি মাসের সুখবর

সূচিপত্র

05 ভাষা আন্দোলনের ঘটনা প্রবাহ

08 একুশের যত প্রথম

10 ভাষা শহীদের প্রকৃত সংখ্যা কত

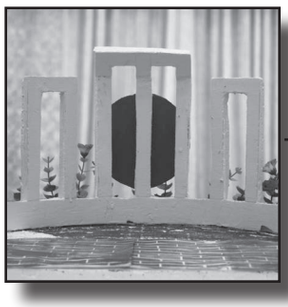

12 একুশের অমর গানগুলো

16 প্রথম শহীদ মিনার ও একজন পিয়ারু সরদার

18 ভাষার উৎপত্তি হল যেভাবে

22 ভিন দেশি ভাষা শিক্ষার উত্তম বয়স

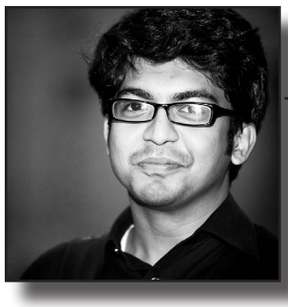

24 অভ্রম্যান মেহেদী হাসান

27 History of Mother Language Day

29 International Mother Language Day: Why is it important?

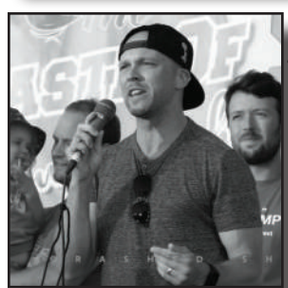

31 Having the Shahid Minar in Beaches-East York is an honour for our community: Brad Bradford

35 MEMORIES OF TORONTO'S FIRST SHAHID MINAR

37 একুশের সমকালীন কবিতা

39 বাংলা টাউনে ভাষার মিনার, ভালোবাসার মিনার

41 পরের একুশ উদযাপন স্থায়ী শহীদ মিনারে করা যাবে ঃ রিজওয়ান

45 ইসলামে মাতৃভাষার গুরুত্ব

46 ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসের রাশিফল

shukhobor-february-2020.indd 4 2020-02-19 2:42 AM

প্রতি মাসের সুখবর

ফিচার

ভাষা আন্দোলনের ঘটনা প্রবাহ

'*দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা কারো দানে পাওয়া নয়* ভাষা শহীদদের উৎসর্গ করে রচিত গানটি কথার মতোই শাশ্বত সত্য বাংলা ভাষার ইতিহাস। মায়ের ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে বাঙ্গালি জাতিকে বলি দিতে হয়েছে প্রাণ, যা সারা দুনিয়াতেই বিরল। চলুন জেনে নিই বাংলা ভাষার লড়াই ও এর নানা ঘটনাপ্রবাহগুলোকে।

জুন, ১৯৪৭:

আবুল মনসুর আহমেদ সম্পাদিত সাপ্তাহিক *মিল্লাতে* বাংলাকে সম্ভাব্য রাষ্ট্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে মত দেয়া হয়।

জুলাই, ১৯৪৭:

আবদুল হক জুন-জুলাই মাসে বাংলা, পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হওয়া উচিৎ বলে বিভিন্ন কলামে লেখেন। অন্যদিকে মুসলিম লীগ ও মুসলীম লীগের বাইরের উর্দুভাষিরা উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা করার জন্য সমর্থন দিতে থাকেন। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দীন আহমেদ এক কনফারেন্সে বলেন 'Only Urdu deserves to be the state language of a Muslim nation.'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের তৎকালিন প্রধান ও প্রখ্যাত ভাষাবিদ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ -এর তিব্র প্রতিবাদ করেন। ১৯৪৭ সালের ২৯ জুলাই, দৈনিক আজাদে 'পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা' শিরোনামে এক কলামে ড. জিয়াউদ্দীন আহমদের বক্তব্য খন্ডন করে তিনি বলেন, "পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৫ ভাগ লোকের মাতৃভাষা হিসেবে বাংলাই নতুন জাতির রাষ্ট্রভাষা হওয়ার যোগ্যতা রাখে। প্রথমে বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে গ্রহন করার পর উর্দু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হতে পারে কি না তা বিবেচনা করা উচিৎ।"

পূর্ব বাংলার 'গণ আজাদি লীগ' নেতা কামরুদ্দিন একই মাসে এক ম্যানিফেস্টে দাবি করেন, বাংলাই হবে আমাদের রাষ্ট্রভাষা। পাকিস্তানের সব জায়গায় বাংলা ভাষা ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া দরকার। পুর্ব পাকিস্তানের একমাত্র আনুষ্ঠানিক ভাষা হবে বাংলা।

ইতিপুর্বে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনি ইস্তিহারে মুসলীম লীগ নেতা আবুল হাশেমও এরকম দাবী জানান।

আগষ্ট, ১৯৪৭

৫ আগস্ট ১৯৪৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল ছাত্ররা Democratic Youth League (DYL) প্রতিষ্ঠা করেন। সংগঠনটি শুরু থেকেই সরকারের উর্দুপ্রীতিসহ বিভিন্ন অসংগতিতে প্রতিবাদ করে।

১৪ আগস্ট, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পর থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার উর্দুর অনানুষ্ঠানিক ব্যবহার শুরু করে দেয়।

সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭:

১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭, ইসলামিক সংস্কৃতি ও চেতনাকে সামনে রেখে সমমনা শিক্ষাবিদ, লেখক ও সাংবাদিকদের সমন্বয়ে 'তমুদ্দিন মজলিস' প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭, তমুদ্দিন মজলিস 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা : বাংলা না উর্দু?' শিরোনামে একটি বুকলেট বের করে। যার গ্রন্থকার কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল মনসুর আহমেদ এবং আবুল কাসেম বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানে অফিস- আদালতে একমাত্র ভাষা হিসেবে ব্যবহারের উপর জোড় দেন। পাশাপাশি বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে প্রচারনা চালান।

নভেম্বর, ১৯৪৭:

করাচিতে শিক্ষামন্ত্রী পূর্ব বাংলার প্রতিনিধি দলসহ 'পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলন' ডাকেন। শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব গৃহিত হয়।

ডিসেম্বর, ১৯৪৭:

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ছাত্ররা সংগঠিত হতে থাকে।

জানুয়ারি, ১৯৪৮

৪ জানুয়ারি ১৯৪৮, East Pakistan Student' League (EPSL) প্রতিষ্ঠিত হয়। সংগঠনটি বাংলা ও বাঙালীর অধিকার আদায়ে সোচ্চার থাকে।

ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮:

২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮, পাকিস্তানের সংবিধান গঠনের প্রথম অধিবেশনে পূর্ব বাংলার কুমিল্লার সদস্য ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও রাষ্ট্র ভাষা করার পক্ষে প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন,

Sir, in moving this- the motion that stands in my name- I can assure the House that I so not in a spirit of narrow Provincialism, but, Sir, in the spirit that this motion receives the fullest consideration at the hands of the members. I know, Sir, that Bengali is a provincial language, but as it is the language of the majority of the people of the State so although it is a provincial language, but as it is language of the majority of the people of the State and it stands on a different footing therefore. Out of six crores and ninety lakhs of inhabiting this State, 4 crores and 40 lakhs of people speak the Bengali language. So, Sir, what should be the State language of the State? The State language of the state should be the language which is used by the majority of the people of the State, and for that, Sir, I consider that Bengali language is a lingua franca of our State. It may be contender with a certain amount of force that even in our sister dominion the provincial language have not got the status of a lingua franca because in her sister dominion of India the proceedings of constituent Assembly is conducted in Hindustani, Hindi or Urdu or English. It is not conducted in the Bengali language but so far as the Bengali is concerned out of 30 crores of people inhabiting that sister dominion two and a half crores speak the Bengali language. Hindustani, Hindi or Urdu has been given and honored place in the sister dominion because the majority of the

shukhobor-february-2020.indd 5 2020-02-19 2:42 AM

people of the Indian Dominion speak that language. So we are to consider that in our State it is found that the majority of people the of the State do speak the Bengali language than Bengali should have an honoured place even in the Central Government.

I know, Sir, I voice the sentiments of the vast millions of our State. In the meantime I wand to let the House know the feelings of the vastest millions of our State. Even , Sir, in the Eastern Pakistan where the people numbering four crores and forty lakhs the Bengali language the common man even if he goes to a Post office and wants to have a money order form finds that the money order is printed Urdu language and is not printer in Bengali language or it is printed in English. A poor cultivator, who has got his son, Sir, as a student in the Dacca University and who wants to send money to him, goes to a village Post office and he asked for a money order form, finds that the money order form is printed in Urdu language. He can not send the money order but shall have to rush to a distant town and have this money order form translated for him and then the money order, Sir, that is necessary for his boy can be sent. The poor cultivator, Sir, sells a certain plot of land or a poor cultivator purchases a plot of land and goes the stamp vendor and pays him money but cannot say whether he has received the value of the money is stamps. The value of the stamp, Sir, is written not in Bengali but is written in Urdu and English. But he cannot say, Sir, whether he has got the real value of the stamp. These are the difficulties experienced by the common man of our State. The language of the State should be such which can be understood by the common man of the State. The common man of the State numbering four crores and forty millions find that the proceedings of this Assembly which is their mother of parliaments is being conduct in a language, Sir , which is unknown to them. Then, Sir, English has got an honoured place, Sir , in Pule 29. I know, Sir, English has got an honoured place because of the International Character.

But, Sir, if English can have an honoured place in Rule 29 that the proceedings of the assembly should be conducted in Urdu or English why Bengali which spoken by four crores forty lakhs of people should not have an honoured place, Sir, in Rule 29 of the procedure Rules. So, Sir, I know I am voicing the sentiments of the vast million of our state and therefore Bengali should not treated as a Provinicial Language. It should be treated as the language of the State and therefore, Sir, I suggest that after the word 'English' , the words 'Bengali' be inserted in Rule 29. I do not wish to detain the House but I wish that the members present here should give a consideration to the sentiments of the vast millions over state, Sir, and should accept the amendment that has been moved by me.

ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের বক্তিতা শেষে তার সমর্থনে বক্তব্য দেন প্রেম হারি বর্মা।

এই প্রস্তাবের তিব্র বিরোধিতা করেন - পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান, কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী সর্দার আবদুর রব খান, কেন্দ্রীয় ত্রান ও পুর্নবাসন মন্ত্রী আলী খান, পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দীন, কাপ (CAP) সদস্য আলহাজ্ব মোহাম্মদ হাসিম এবং তমিজুদ্দিন খান।

২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮, ধীরেন্দ্র নাথ দত্তর প্রস্তাবকে সমর্থন করে বক্তব্য দেন ভুপেন্দ্র কুমার ও শ্রী চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মার্চ, ১৯৪৮:

২ মার্চ ১৯৪৮, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডান, বাম ও মধ্যপন্থীদের নিয়ে 'রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়।

১১ মার্চ ১৯৪৮, বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করার দাবিতে সংগঠনটি প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করে। ঢাকায় পুলিশ আন্দোলনকারিদের লাঠিপেটা ও গ্রেফতার করে। ১১ মার্চ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে প্রথম সংগঠিত গণবিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সিদ্বান্তে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। এই বিক্ষোভ ও আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে নাজিমুদ্দিন সরকারের সাথে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের ৭ দফা চুক্তি হয়।

২১ মার্চ ১৯৪৮, পাকিস্তানের তৎকালিন গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে বলেন,
"State language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. Any one who tries to mislead you is really an enemy of Pakistan"

সমাবেত ছাত্ররা এর প্রতিবাদ জানায়।

মার্চের শেষ সপ্তাহে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সহায়তায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চার হলের ভি, পি এবং জি, এস সহ ১০ জন ছাত্রের একটি প্রতিনিধি দল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সাথে দেখা করে।

নাজিমুদ্দীনের সাথে চুক্তির পর থেকে ভাষা সংগ্রাম খানিকটা ঝিমিয়ে পড়ে। এর পুনর্জাগরন, ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় আবার শুরু হয় ১৯৫২ সালের জানুয়ারিতে।

জানুয়ারি ১৯৫২:

২৭ জানুয়ারি ১৯৫২, খাজা নাজিমুদ্দীন পল্টনের এক জনসভায় জিন্নাহর ঘোষণার পুনারক্তি করেন। এছাড়া পাকিস্তান সংবিধান গঠন পরিষদের এক অধিবেশনে উর্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রাভাষা হিসেবে সুপারিশ করা হয়।

একই তারিখে পূর্ব পাকিস্তান যুব লীগ এবং পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় একটি প্রতিবাদ সভা ও মিছিলের আয়োজন করে।

২৮ জানুয়ারি ১৯৫২, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এক প্রতিবাদ সভায় প্রধানমন্ত্রী ও মূখ্যমন্ত্রীর সমালোচনা করে।

৩০ জানুয়ারি ১৯৫২, পূর্ব পাকিস্তান যুব লীগ, পূর্ব পাকিস্তান স্টুডেন্টস লীগ এবং সম্মিলিত ছাত্র সংগ্রাম কাউন্সিলের ডাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট পালিত হয়।

shukhobor-february-2020.indd 6 2020-02-19 2:42 AM

৩১ জানুয়ারি ১৯৫২, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রধান মাওলানা ভাষানী ঢাকা বার কাউন্সিল লাইব্রেরীতে বিরোধী দলগুলোকে নিয়ে এক সভা আহবান করেন। খিলাফত- ই-রব্বানী, তমুদ্দিন মজলিস, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ, পূর্ব পাকিস্তান যুব লীগ সভায় অংশ গ্রহন করে। সভায় মাওলানা ভাষানীকে সভাপতি ও কাজী গোলাম মাহবুবকে আহবায়ক করে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়।

ফেব্রুয়ারি ১৯৫২:

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরে ছাত্র ধর্মঘট, মিছিলের ও ২১ ফেব্রুয়ারি সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল ও বিক্ষোভ সমাবেশের কর্মসূচি ঘোষণা করে।

২০ ফেব্রুয়ারি পরের দিনের কর্মসূচিকে বানচাল করার জন্য ঢাকাতে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়।

সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে ফকির সাহবুদ্দিনের সভাপতিত্বে এক মিটিং-এ ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

২১ফেব্রুয়ারি ১৯৫২:

সকাল ৮টা থেকেই ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে হতে থাকে। সকাল সাড়ে ১১ টা নাগদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল, মেডিক্যাল কলেজ, বুয়েট ও বহিরাগত হাজার হাজার ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবেত হয়ে *রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই* শ্লোগান দিতে থাকে।

আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সম্পদাক শামসুল হক প্রথমে উপস্থিত ছাত্রদের উদ্দেশ্য বক্তিতা দেন। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্র ভাষা কার্যকরি পরিষদের আহবায়ক আব্দুল মতিন ও সভাপতি গাজিউল হক ১৪৪ ধারা ভঙ্গের ঘোষণা দিয়ে ভাষন দেন।

আব্দুস সামাদ আজাদের পরিকল্পনা অনুসারে সিদ্বান্ত হয় ছাত্ররা দশ জনের দলে ভাগ হয়ে মিছিল করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করবে। হাবিবুর রহমান শেলীর নেতৃত্বে প্রথম দল, আব্দুস সামাদ আজাদের নেতৃত্বে দ্বিতিয় দল, আনোয়ারুল হকের নেতৃত্বে তৃতীয় দল এবং ছাত্রীদের দ্বারা চতুর্থ দল মিছিল করে এগিয়ে যায়। শান্তিপূর্ন এই মিছিলে পুলিশি হামলা পরিস্থিতি জটিল করে তোলে। একদিকে পুলিশ টিয়ার গ্যাস ছুড়তে থাকে, ইট মেরে ছাত্ররা পাল্টা জবার দেয়। একটি টিয়ার শেল গাজিউল হককে আঘাত করলে তাকে অচেতন অবস্থায় ছাত্রীদের কমনরুমে নিয়ে যাওয়া হয়।

দুপর ৩ টায় জেলা প্রশাসকের নির্দেশে সশ্রস্ত্র পুলিশের একটি গ্রুপ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের হোস্টেলের বিপরীত দিকে অবস্থান নিয়ে গুলি ছোড়ে।

আহতদের মেডিক্যালে ও মৃতদেহ মর্গে নিয়ে যাওয়া হয়। রাতের আঁধারে সেনাবাহীনির একটি দল মর্গ থেকে লাশ নিয়ে নিকটস্থ আজিমপুর কবরস্থানে সমাহিত করে। সেদিনের শহীদদের প্রকৃত সংখ্যা সম্পর্কে মতভেদ আছে, তবে আহতদের সংখ্যা ২ শতাধিক ছিল বলে জানা যায়।

২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২, হাজার হাজার নারী-পুরুষ শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আসে। সমবেত জনতা মিছিল করার চেষ্টা করলে পুলিশ গুলি চালায়। ধারনা করে হয় এতে চার জন নিহত হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে সেনাবাহিনী তলব করা হয়।

অবশেষে জনতার চাপে হার মেনে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমিন বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সংবিধানে অন্তরভুক্ত করার প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২, সারা দেশে স্বতস্পুর্ত হরতাল পালিত হয়। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষার্থিরা বরকত শহিদ হওয়ার স্থানে শহিদ মিনার তৈরি করে।

২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২, সরকার পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনার আদেশ দেয়। এই সময়ে পুলিশ বহু সংখ্যক ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতাকে গ্রেফতার করে।

৭ মে ১৯৫৪:

পাকিস্তানের সরকার বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেয়।

২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬:

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিয়ে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান পাশ হয়।

বিশ্ব স্বীকৃতি:

১৯৫৩ সাল থেকে প্রতিবছর বাঙ্গালীরা ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটি বিশেষভাবে পালন করে আসছে। তবে এর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ আসে ১৯৯৮ তে।

৯ জানুয়ারী ১৯৯৮, কানাডা প্রবাসী রফিকুল ইসলাম বিশ্বের ভাষাসমূহের বিলুপ্তি রোধে ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের অনুরোধ জানিয়ে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানকে চিঠি লেখেন।

২০ জানুয়ারি ১৯৯৮, মহাসচিব অফিসের চিফ ইনফরমেশন অফিসার হাসান ফেরদৌস, রফিককে প্রস্তাবটি জাতিসংঘের কোন সদস্য দেশের মাধ্যমে পাঠানোর পরামর্শ দেন।

রফিক; আব্দুস সালমকে সঙ্গে নিয়ে এই উদ্দেশ্যে একটি দল গঠন করেন।

১৯৯৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে রফিক UNESCO (United Nation Educational Scientific and Cultural Organization) এর এনা মারিয়ার সাথে যোগাযোগ করেন।

প্রস্তাবটি তৎকালিন শিক্ষা মন্ত্রী, শিক্ষা সচিব, ইউনেস্কোর একাধিক বাঙালী কর্মকর্তার কাছে পৌছায় এবং তা বাস্তবায়নে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা চলতে থাকে।

৯ সেপ্টেবর ১৯৯৯, ইউনোস্কোতে প্রস্তাব দাখিলের শেষ সময়ের মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে প্যারিসের সদর দফতরে প্রস্তাব পাঠানো হয়।

১৭ নভেম্বর ১৯৯৯ সালে প্রস্তাবটি উপস্থাপন করা হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়।

UNESCO এর স্বীকৃতিতে বলে,

"The recognition was given bearing in mind that all moves to promote the dissemination of mother tongues will serve not only to encourage linguistic diversity and multilingual education but also to develop fuller awareness about linguistic and cultural traditions throughout the world and to inspire solidarity based on understanding , tolerance and dialogue."

আজ বিশ্বের ১৯২টি দেশে ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে।

(সংকলিত)

shukhobor-february-2020.indd 7 2020-02-19 2:42 AM

প্রতি মাসের সু খবর

ফিচার

একুশের যত প্রথম

॥ সুলতানা তৃষা ॥

আজ আমরা যে ভাষায় কথা বলছি, যে ভাষায় গান গাইছি, যে ভাষাকে ভালোবাসছি, যে ভাষায় কথা বলা আমাদের আত্মতৃপ্তি দান করছে, সেই ভাষা আমরা পেয়েছি কিছু আত্মত্যাগী মানুষের জন্যে। বিনম্র শ্রদ্ধাভরে আমরা স্মরণ করছি তাদের। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস আমরা সবাই কমবেশি জানি। আজকে আমরা জানবো ভাষা আন্দোলনে যতোসব প্রথম।

একুশের প্রথম ভাষা শহীদ

একুশের প্রথম ভাষা শহীদ রফিকউদ্দিন আহমদ। মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলার পারিল গ্রামে ছিল তাঁদের বাড়ি। ঘটনার সময় শহীদ রফিকের বয়স ছিলো২৬ বছর। ১৯৫২-র ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনের রাস্তায় ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে বিক্ষোভ প্রদর্শনরত ছাত্র-জনতার মিছিলে রফিক অংশগ্রহণ করেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের হোস্টেল প্রাঙ্গনে পুলিশ গুলি চালালে সেই গুলি রফিকউদ্দিনের মাথায় লাগে। গুলিতে মাথার খুলি উড়ে গিয়ে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রথম শহীদ মিনার

প্রথম শহীদ মিনার হয়েছিলো রাজশাহীতে। ১৯৫২ সালের ২২ই ফেব্রুয়ারি পরিকল্পনা এবং ২৩শে ফেব্রুয়ারি তারিখ দিবাগত রাতে রাজশাহী কলেজ ছাত্রাবাস সংলগ্ন এলাকায় এর নির্মাণকাজ শুরু হয়। এর মূল পরিকল্পনাকারী ছিলেন সাইদ হায়দার। এর দৈর্ঘ্য ছিলো দশ ফিট এবং প্রস্থ ছয় ফিট। এই মিনারটি উদ্বোধন করেন ভাষা শহীদ সফিউর রহমানের পিতা মৌলভী মাহাবুবুর রহমান। কিন্তু পরে পাকিস্তানি আর্মি-পুলিশরা এই মিনারটি ভেঙ্গে ফেলে।

ঢাকায় নির্মিত প্রথম শহীদ মিনার

২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ গভীর রাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ব্যারাক হোস্টেলের ১২নং গেটের সামনে মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের সম্মিলিত শ্রমে নির্মিত হয়েছিল প্রথম শহীদ মিনার।এর নকশাকার ছিলেন ডা. বদরুল আলম।

প্রথম শহীদ দিবস

১৯৫৩ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি প্রথম শহীদ দিবস এই দিনে প্রথমবারের মতো পালন করা হয় শহীদ দিবস। দীর্ঘ শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয় সেদিন। শোভাযাত্রীরা শোকজ্ঞাপক কালো ব্যাজ,কালো পতাকা ধারণ করে ‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই’ স্লোগান দিতে দিতে অগ্রসর হতে থাকে। সেবারই প্রথম উৎযাপিত হয় শহীদ দিবস।

প্রথম লিফলেট

ভাষা আন্দোলনের প্রথম লিফলেট প্রকাশিত হয় ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি গুলি বর্ষণের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। গুলি বর্ষণের অল্প কিছুক্ষণ পরই হাসান হাফিজুর রহমান, আমীর আলীসহ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের উল্টোদিকে ক্যাপিটাল প্রেসে চলে যান। সেখানে গিয়ে হাসান হাফিজুর রহমান লিফলেটের খসড়া তৈরি করেন। দুই তিন ঘণ্টার মধ্যেই লিফলেটটি ছাপার কাজ সম্পন্ন হয়। হাসান হাফিজুর রহমান লিফলেটটি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আসেন। প্রায় দুই/তিন হাজার লিফলেট ছাপানো হয়েছিল। উৎসাহী ছাত্ররাই এ লিফলেটগুলো

shukhobor-february-2020.indd 8 2020-02-19 2:42 AM

১৯৫৪ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি: দ্বিতীয় শহীদ দিবসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুরাতন কলাভবন প্রাঙ্গণে নির্মিত শহীদ মিনার।

চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। আশেপাশের সমগ্র এলাকায় পৌঁছে যায় লিফলেটগুলো।

প্রথম কবিতা

১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের সমর্থনে প্রথম কবিতা রচনা করেন মাহবুব উল আলম চৌধুরী। নাম 'কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি'। পাকিস্তান সরকার সে কবিতা বাজেয়াপ্ত করল। হুলিয়া জারি হলো মাহবুব উল আলম চৌধুরীর ওপর। তিনি এবং তাঁর কবিতা হয়ে গেল ইতিহাসের অংশ। 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি- একুশের প্রথম কবিতা।

প্রথম গান

একুশের গান হিসেবে অধিক সমাদৃত "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো" গানটি। তবে এটি প্রথম গান নয়। ভাষা আন্দোলনভিত্তিক প্রথম গানের প্রথম চরণ 'ভুলব না, ভুলব না, একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলব না'। যার রচয়িতা ভাষা সৈনিক আ ন ম গাজিউল হক। ১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকার আর্মানিটোলা ময়দানের জনসভায় গানটি গাওয়া হয়।

প্রথম গল্প

১৯৫২ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্রজনতা হত্যার পর রচিত একুশের প্রথম গল্পের নাম 'মৌন নয়ন'। গল্পটির রচয়িতা বিশিষ্ট কবি ও কথাশিল্পী শওকত ওসমান। ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত একুশের প্রথম সংকলন 'একুশে ফেব্রুয়ারি' গ্রন্থে গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

প্রথম সংকলন

১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে একুশের প্রথম সংকলন সম্পাদনা করেছিলেন বাঙালি সংস্কৃতির অন্যতম কৃতী পুরুষ কবি হাসান হাফিজুর রহমান। প্রকাশক ছিলেন অন্যতম ভাষাসৈনিক মুহাম্মদ সুলতান। পুঁথিপত্র প্রকাশনার মাধ্যমে প্রকাশিত এই সংকলনের প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন আমিনুল ইসলাম। রেখাচিত্র এঁকেছিলেন মর্তুজা বশীর। সংকলনটি পাইওনিয়ার প্রেসের পক্ষ ছাপা হয়। এই সংকলনে স্থান পেয়েছিল একুশের প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, গান, নকশা ও ইতিহাস।

প্রথম নাটক

মুনির চৌধুরী এবং তার রচিত নাটক 'কবর' এর নাম শুনেনি এমন মানুষ বিরল। ভাষা আন্দোলনে জড়িত থাকার 'অপরাধে' '৫২ সালে জেলে আটক ছিলেন মুনির চৌধুরী, রণেশ দাশগুপ্তসহ অনেক লেখক-সাংবাদিক। মুনীর চৌধুরী '৫৩ সালে জেলে বসেই কবর নাটকটি রচনা করেন । ওই বছরের ২১ ফেব্রুয়ারি, রাত ১০টায় জেলকক্ষগুলোর বাতি নিভিয়ে দেওয়ার পর হ্যারিকেনের আলো- আঁধারিতে মঞ্চস্থ হয় কবর।

প্রথম উপন্যাস

একুশের প্রথম উপন্যাস জহির রায়হান রচিত 'আরেক ফাল্গুন'। শহীদ দিবস পালন, শহীদ মিনার নির্মাণ ভাষা আন্দোলনের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটানো হয় এই উপন্যাসে। ৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির রক্তাক্ত ঘটনার মাত্র তিন মাস পর ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে রচিত হয় এই উপন্যাসটি।

প্রথম সিনেমা

একুশের চেতনা নিয়ে প্রথম নির্মিত সিনেমা 'জীবন থেকে নেয়া'। ১৯৭০ সালে জহির রায়হান সিনেমাটি পরিচালনা করেন। সিনেমাটি সে সময় ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। পরবর্তিতে স্বাধীনতা আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা রাখে সিনেমাটি।

প্রথম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

২০০০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি প্রথম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়। জাতিসংঘের ১৮৮টি দেশ একসঙ্গে প্রথম ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করে। এর আগে ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর জাতিসংঘের সংস্থা ইউনেস্কো আনুষ্ঠানিকভাবে দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা দেয়। বাংলাদেশ ইউনেস্কোর সাধারণ সম্মেলনের ৩০তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে প্রস্তাবটির খসড়া পেশ করে। বাংলাদেশকে সমর্থন জানায় ২৭টি দেশ।

অমর একুশে আমাদের অহংকার, আমাদের গর্ব।

বিশ্বের কোন দেশের মানুষ মাতৃভাষার জন্য এভাবে আন্দোলন করেনি, অকাতরে প্রাণ দেয়নি। সে অবস্থান থেকে বাংলাভাষার একটি বিশেষ স্থান আছে এবং সবসময় থাকবে। বাঙ্গালি হিসেবে আমাদের উচিত ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা। আসুন আজকের এই দিনে আমরা শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে ভাষা বিকৃতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণের প্রতিজ্ঞা করি।

সুলতানা তৃষা

shukhobor-february-2020.indd 9 2020-02-19 2:42 AM

বাংলা একাডেমিতে ভাষা শহীদের নিয়ে ভাস্কর্য মোদের গরব

প্রতি মাসের খবর

ফিচার

ভাষা শহীদের প্রকৃত সংখ্যা কত

॥ মহিউদ্দিন আহমেদ ॥

ছোটবেলায় স্কুলে পড়ার সময় দুটো শব্দের সঙ্গে পরিচয় হয়: শহীদ দিবস এবং প্রভাতফেরী। শহীদ দিবস হলো একুশে ফেব্রুয়ারি। ১৯৫২ সালের ওই দিনে ঢাকায় কয়েকজন তরুণের বুকের রক্ত ঝরেছিল বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে। প্রতিবছর ওই দিনটি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হয়। স্কুল বন্ধ থাকে। সব বয়সের মানুষ ভোরবেলা হাতে ফুল নিয়ে জামায় বা শাড়িতে কালো ব্যাজ পরে খালি পায়ে হেঁটে শহীদ মিনারে যান শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানাতে- এটাই প্রভাতফেরী।

সারা বছর ধরেই যেহেতু শহীদেরা সংবাদ শিরোনাম হন, তাঁদের নিয়ে আলোচনা, সেমিনার কিংবা খবরের কাগজে ক্রোড়পত্র ছাপা হয়, বায়ান্নর শহীদদের আলাদা করে বোঝানোর ও চেনানোর উপায় একটা বের হয়েছে। আমরা এখন বলি 'ভাষাশহীদ'। অর্থাৎ মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য যাঁরা জীবন দিয়েছেন। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে আমাদের এ অঞ্চলের সাম্প্রতিক ইতিহাসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। একাত্তর সালে আমরা স্বাধীন হয়েছিলাম। স্বাধীনতার বীজটি কিন্তু বোনা হয়েছিল ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই। সুতরাং বলা চলে, ভাষাশহীদেরাই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহীদ। মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ শুরু হয়ে ১৬ ডিসেম্বর শেষ হয়ে গেল, এ রকম একটি সরল গল্পে আমরা অনেকেই বুঁদ হয়ে আছি। মুক্তিযুদ্ধের যে দীর্ঘ বিস্তৃত পটভূমি, তাকে উপেক্ষা করে বা হিসাবে না রেখে এ দেশের ইতিহাস হবে খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ। বায়ান্নর ভাষাশহীদেরাই আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়ে আমাদের পথচলার শুরুটা করে দিয়েছিলেন এবং নানা চড়াই-উতরাই পার হয়ে একটা সর্বাত্মক জনযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা আলাদা রাষ্ট্র পেয়েছি।

বায়ান্নর ফেব্রুয়ারি নিয়ে অনেক লেখাজোকা হয়েছে। আরও হবে। আমরা পাঁচজন শহীদের নাম বেশি বেশি শুনতে পাই: সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার ও শফিউর। এঁদের মধ্যে বরকত ও জব্বার ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। রফিক ছিলেন বাদামতলী কমার্শিয়াল প্রেসের মালিকের ছেলে। এঁরা তিনজন নিহত হন ২১ তারিখে। পরদিন ২২ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে মারা যান রিকশাচালক সালাম এবং হাইকোর্টের কর্মচারী শফিউর। ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক অলি আহাদের ভাষ্যে জানা যায়, ২২ ফেব্রুয়ারি ভিক্টোরিয়া পার্কের (বর্তমান বাহাদুর শাহ পার্ক) আশপাশে, নবাবপুর রোড ও বংশাল রোডে গুলিতে কতজন মারা গেছেন, তার সঠিক সংখ্যা কারও জানা নেই। আহমদ রফিক তাঁর একুশ থেকে একাত্তর বইয়ে নিহতদের মধ্যে আবদুল আউয়াল, কিশোর অহিউল্লাহ ও সিরাজুদ্দিনের নাম উল্লেখ করেছেন।

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনকে নিয়ে প্রথম স্মারকগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৩ সালের মার্চে। এর প্রকাশক ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের প্রথম সভাপতি মোহাম্মদ সুলতান। সম্পাদক ছিলেন হাসান হাফিজুর রহমান। ওই বইয়ে কবির উদ্দিন আহমেদ 'একুশের ঘটনাপুঞ্জী' নামে একটি প্রতিবেদনে লিখেছেন, 'শহীদদের লাশগুলো চক্রান্ত করে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। মেডিকেল

shukhobor-february-2020.indd 10 2020-02-19 2:42 AM

হোস্টেলের ভেতর "গায়েবি জানাজা" পড়া হলো।...(পরদিন) সকাল নয়টায় জনসাধারণের এক বিরাট অংশ মর্নিং নিউজ অফিস জ্বালিয়ে দেয় এবং সংবাদ অফিসের দিকে যেতে থাকে। সংবাদ অফিসের সম্মুখে মিছিলের ওপর মিলিটারি বেপরোয়া গুলি চালায়। অনেকেই হতাহত হয় এখানে।'

প্রশ্ন হলো ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি মোট কতজন 'হতাহত' হয়েছিলেন, কতজন 'নিহত' হয়েছিলেন তার সঠিক সংখ্যাটি কি আমরা জানি? কখনো জানার চেষ্টা করেছি? কবির উদ্দিন আহমেদের বিবরণ অনুযায়ী, ২৪ ফেব্রুয়ারি 'সর্বদলীয় কর্মপরিষদের' পক্ষ থেকে 'সর্বমোট ৩৯ জন শহীদ হয়েছেন বলে দাবি করা হয়' এবং একই সঙ্গে সরকারের কাছে একটি 'নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন নিয়োগের' আহ্বান জানানো হয়।

২১ ফেব্রুয়ারি গুলিবর্ষণের প্রতিবাদ হয়েছিল ব্যাপক। ওই দিন সন্ধ্যায় গণতান্ত্রিক যুবলীগের চট্টগ্রাম জেলা শাখার আহ্বায়ক এবং সীমান্ত পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী রোগশয্যায় বসে 'কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি' শিরোনামে একটি দীর্ঘ কবিতা লেখেন। কবিতার প্রথম কয়েকটি লাইন ছিল:

ওরা চল্লিশজন কিংবা আরও বেশি
যারা প্রাণ দিয়েছে ওখানে রমনার রোদ্রদগ্ধ
কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায়...
চল্লিশটি তাজা প্রাণ আর অঙ্কুরিত বীজের খোসার মধ্যে
আমি দেখতে পাচ্ছি তাদের অসংখ্য বুকের রক্ত
রামেশ্বর, আবদুস সালামের কচি বুকের রক্ত...

এখানে কবি যে ৪০ সংখ্যাটি উল্লেখ করলেন, তা কি নিছক ছন্দ মেলানোর জন্য, নাকি এর মধ্যে সত্যতা আছে? আমরা এ যাবৎ আটজন শহীদের নাম পেয়েছি। সংখ্যাটি কি এখানেই শেষ? এ দেশে পুলিশের বিরুদ্ধে লাশ গুম করার অভিযোগ তো নতুন নয়। পাকিস্তানের নির্বাসিত লেখক লাল খান তাঁর পাকিস্তানস আদার স্টোরি: দ্য ১৯৬৮-৬৯ রেভল্যুশন বইয়ে লিখেছেন, পুলিশের গুলিতে ২৬ জন নিহত এবং ৪০০ জনের মতো আহত হয়েছিলেন। বইটি ২০০৮ সালে লাহোরে প্রকাশিত হয়। তাঁর ওই বইয়ে তথ্যসূত্রের উল্লেখ নেই। তিনি পুলিশ বা গোয়েন্দা রিপোর্টের সাহায্য নিয়েছিলেন কি না জানি না।

বায়ান্নর ২১-২২ ফেব্রুয়ারি তারিখে যাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, তাঁরা আমাদের জাতীয় বীর। তাঁদের রক্তের পথ বেয়েই আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। অথচ তাঁরা সংখ্যায় কতজন, কী তাঁদের নাম, কোথায় তাঁদের বাড়ি, কী ছিল তাঁদের পেশা—এ নিয়ে অনুসন্ধানের কোনো আগ্রহ আমরা দেখাইনি। এটা সত্য যে ভাষা আন্দোলনে ওই সময়ের কোনো নেতা বা অ্যাকটিভিস্ট প্রাণ দেননি। প্রাণ দিয়েছিলেন সাধারণ মানুষ। ইতিহাসে আমজনতা বরাবরই থাকেন উপেক্ষিত, এলিটরা পদ-পদক-পদবি পাওয়া কিংবা না-পাওয়া নিয়ে মান-অভিমান করেন।

পুলিশের কাজের ধরন আমার জানা নেই। তাদের মহাফেজখানায় কি পুরোনো কোনো রেকর্ড নেই, যার সূত্র ধরে আমরা ভাষাশহীদদের সংখ্যা ও পরিচয় জানতে পারব? আমার জানতে ইচ্ছে হয়, এ নিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো উদ্যোগ কখনো নেওয়া হয়েছে কি না, অথবা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে? অনাদরে, অবহেলায় আমরা ইতিহাসের অনেক তথ্য-উপাত্ত হারিয়েছি। অথচ একটু উদ্যোগ নিলে, একটু সদিচ্ছা দেখালে এ বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধান চালানো যায়।

আমরা ইতিহাস নিয়ে রাজনীতি করি, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ইতিহাস বিকৃতির নালিশ জানাই। কিন্তু ইতিহাসের সত্য জানার জন্য কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নিতে ইতস্তত করি। শহীদেরা কি সব সময় রাজনীতির কাঁচামাল এবং ক্ষমতায় যাওয়ার সিঁড়ি হিসেবেই ব্যবহৃত হবেন? বছরে একদিন তাঁদের স্মরণে একটি বিবৃতি দিয়েই কি আমরা দায়িত্ব সারব?

এ দেশে সর্বজনীন 'শহীদ' কয়জন? রাজনীতির বিভাজনের কারণে এক পক্ষের শহিদ অন্য পক্ষের কাছে খলনায়ক। কিন্তু ভাষাশহিদেরা তো সব বিতর্কের ঊর্ধ্বে। তাঁরা আমাদের সবার। এখন হয়তো তাঁদের নিয়ে

মাতম হয় না। কিন্তু যত দিন বাংলা ভাষা থাকবে, আমরা বায়ান্নর কথা স্মরণ করব। ভাষাশহিদদের জন্য আমরা আবেগ অনুভব করব।

আমাদের স্বপ্নের পদ্মা সেতু তৈরি হচ্ছে। আমি প্রস্তাব করছি, এই সেতু ভাষাশহীদদের নামে উৎসর্গ করা হোক, নাম রাখা হোক ভাষাশহীদ সেতু। আমাদের পূর্বসূরিদের রক্তের ঋণ শোধ করার এটি হবে একটি অকিঞ্চিৎকর প্রয়াস। শহীদস্মৃতি অমর হোক।

মহিউদ্দিন আহমদ *লেখক ও গবেষক*

shukhobor-february-2020.indd 11 2020-02-19 2:42 AM

প্রতি মাসের সুখবর

ফিচার

একুশের অমর গানগুলো

ফেব্রুয়ারি এলেই দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে বাংলা বর্ণমালার রঙ। অমর একুশে গ্রন্থ মেলা থেকে শুরু করে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে এর রূপ, রস, ঘ্রাণ। আর একুশে ফেব্রুয়ারি এলে তো কথাই নেই। নগ্ন পায়ে, স্নিগ্ধ চিত্তে, হাতে ফুল, বুকে ভালবাসা নিয়ে অন্তরে অন্তরে উচ্চারিত হয় মধুর ধ্বনি, "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি"। সেই ভুলতে না পারার কাব্যে আরও কত শত গান রচিত হয়ে গেছে ভাষার আবেগে। সেই বিপুল ভান্ডার থেকে কিছু সুপরিচিত গানের স্মৃতি রোমন্থনেই আজকের এই প্রয়াস।

ভাষা আন্দোলনের পটভূমি তৈরি হয় যখন দুই ভিন্ন সংস্কৃতিমনা দেশের মিলন সন্ধির চেষ্টা শুরু তখন থেকে। ১৯৪৮ থেকেই বাংলা ভাষার জন্য প্রাণের মিনতি শুরু হয়ে যায়। ঐ বছর ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করলেন- "যদি সত্যিই পাকিস্তানকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই, তাহলে তার রাষ্ট্রভাষা হবে একটি এবং উর্দুই হবে পকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।"

বাঙালির নাড়ির খবর তখনও পাকিস্তানিদের অজানা। ভাষার টান যে কতদূর পর্যন্ত গড়াতে পারে তার দৃশ্যপট তখনও আঁকা হয়নি তাদের মনে। জিন্নার ঘোষণার পরপরই শুরু হয়ে গেল শহরজুড়ে ক্ষোভ আর হতাশা। বাংলা ভাষাভাষীর মানুষ কখনও আপন করে নিতে পারেনি উর্দুকে। তাই রক্ত টগবগে হয়ে উঠে বাংলার দামাল ছেলেদের। আর তারই টানে অধ্যাপক আনিসুল হক চৌধুরি (১৯১৯-২০০৯) সেই রাতেই ভাষার জন্য প্রথম গানটি রচনা করেন-

"শোনেন হুজুর
বাঘের জাত এই বাঙালিরা
জান দিতে ডরায়না তারা
তাদের দাবি বাংলা ভাষা
আদায় করে নেবেই!"

প্রখ্যাত গণসঙ্গীতশিল্পী শেখ লুতফর রহমান (১৯২১-১৯৯৪) গানটিতে সুরারোপ করেন। ভাষার তৃষ্ণায় কেটে গেল আরও চারটি বছর। এর মধ্যে আরও কিছু উল্লেখযোগ্য গান ও কবিতা তৈরি হয়। সকলের মনে তখন ভাষার জন্য ডামাডোল চলছে। পাকিস্তানি সরকারও ছক গুছিয়ে নিচ্ছিল কী করে আরও সুগঠিত করতে পারে তাদের সিদ্ধান্তের চিরন্তন ব্যবস্থায়।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি (৮ই ফাল্গুন, ১৩৫৮), দিনটির কথা আর নতুন করে বাঙালিকে স্মরণ করিয়ে দিতে হয় না। সমগ্র পৃথিবীজুড়ে বাংলা ভাষার স্তুতি হয়তো পাকিস্তানীদের বুকে সারা জীবনের পীড়া হয়ে গেঁথে থাকবে। এই দিনটির শোকাবহ ছায়া মর্মাহত, ব্যথিত করে বাঙালিদের। গর্জে উঠে ভাষা সংগ্রামী গাজীউল হকের (১৯২৯-২০০৯) লেখনি-

shukhobor-february-2020.indd 12 2020-02-19 2:42 AM

"ভুলবো না ভুলবো না
ভুলবো না সেই একুশে ফেব্রুয়ারি
ভুলবো না...
লাঠি গুলি আর টিয়ার গ্যাস
মিলিটারি আর মিলিটারি
ভুলবো না।।

রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই
এই দাবিতে ধর্মঘট
বরকত সালামের
খুনে লাল ঢাকার রাজপথ।।"

গাজীউল হকের ছোট ভাই নিজাম উল হক সাথে সাথে বসে গেলেন জ্বালাময়ী এই গীত-কবিতায় সুরারোপ করতে। প্রতিবাদের শব্দ-বৃষ্টি যেন ঝড়ছিল গানটির চরণে চরণে। মুষ্টিবদ্ধ হাত উচিয়ে ধরে যেন সংগ্রামী কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছিল প্রতিবাদের শব্দবৃষ্টি- "*ভুলব না, ভুলব না।*"

অমর একুশের আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত একাধিক ভাষাসংগ্রামী তাঁদের একুশের স্মৃতিচারণামূলক রচনায় গাজীউল হকের গানটিকে একুশের প্রথম গান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ১৯৫৩-৫৫ সালে এই গানটি গেয়ে প্রভাতফেরি করা হতো। গাজীউল হক পরবর্তীকালে আরও কিছু গান রচনা করেন যার পটভূমি বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি। তিনটি গানের কয়েকটি চরণ:

১) "বাংলার বুকের রক্তে রাঙানো আটই ফাল্গুন/ ভুলতে কি পারি শিমুলে পলাশে হেরি লালে লাল খুন",

২) "বাংলাদেশ আর বাংলা ভাষা যখন একই নামের সুতোয় বাঁধা"।

৩) "শহীদ তোমায় মনে পড়ে, তোমায় মনে পড়ে। তোমার কান্না তোমার হাসি আমার চোখে ঝরে।"

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে পুলিশ ভাষা আন্দোলনকারী ছাত্রদের মিছিলে গুলি চালায়। এতে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার প্রমুখ ছাত্র হতাহত হন। সেসময় ঢাকা কলেজের ছাত্র আবদুল গাফফার চৌধুরী ঢাকা মেডিকেলে যান আহত ছাত্রদের দেখতে। ঢাকা মেডিকেলের আউটডোরে তিনি মাথার খুলি উড়ে যাওয়া একটি লাশ দেখতে পান, যেটি ছিল ভাষা সংগ্রামী রফিকের লাশ।

লাশটি দেখে তার মনে হয়, এটা যেন তার নিজের ভাইয়েরই রক্তমাখা লাশ। তৎক্ষণাৎ তার মনে গানের প্রথম দুইটি লাইন জেগে উঠে। পরে কয়েকদিনের মধ্যে ধীরে ধীরে তিনি গানটি লিখেন। ভাষা আন্দোলনের প্রথম প্রকাশিত লিফলেটে এটি 'একুশের গান' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। ১৯৫৩ সালে হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'একুশে সংকলনে'ও এটি প্রকাশিত হয়।

"আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি

ছেলে হারা শত মায়ের অশ্রু-গড়া এ ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি

আমার সোনার দেশের রক্ত রাঙানো ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি।"

এতে প্রথমে সুর দিয়েছিলেন গীতিকার-সুরকার ও শিল্পী আবদুল লতিফ। পরবর্তী সময়ে এতে সুর-যোজনা করেন আরেক মহৎ সুরস্রষ্টা আলতাফ মাহমুদ। গানটির করুণ বিষণ্ন সুর প্রতিটি হৃদয়কে স্পর্শ করে। শোক বিহ্বল করে তোলে শ্রোতার হৃদয়। কথা ও সুরের এমন শৈল্পিক সুষমা এ গানকে শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ গানে উন্নীত করেছে। পরবর্তীতে প্রভাতফেরির অনিবার্য গান হয়ে ওঠে গানটি।

আবদুল গাফফার চৌধুরী অমর একুশে নিয়ে আরও কয়েকটি অনিন্দ্যসুন্দর গান রচনা করেছেন। দুটি গানের কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করছি:

১) 'রক্তে আমার আবার প্রলয় দোলা/ ফাল্গুন আজ চিত্ত আত্মভোলা/ আমি কি ভুলিতে পারি/ একুশে ফেব্রুয়ারি,'

২) 'শহীদ মিনার ভেঙেছো আমার ভাইয়ের রক্তে গড়া/ দ্যাখো বাংলার হৃদয় এখন শহিদ মিনারে ভরা।.../ এত রক্তের প্রাণকল্লোল সাগরে দেবেই ধরা।'

একুশে ফেব্রুয়ারি রক্তাক্ত ঘটনার পর গীতিকার শামসুদ্দীন আহমদ রচনা করেছিলেন একটি মর্মস্পর্শী গান যেটি পল্লীগীতির সুরে

shukhobor-february-2020.indd 13 2020-02-19 2:42 AM

সুরারোপিত হয়। গানটি শুনলে মনে হয় চোখের সামনেই যেন চাক্ষুষ দেখতে পারছি শহীদদের আত্মদান। তখন মনে হয় শহীদের এই বলিদান বৃথা যায়নি।

"রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন করিলিরে বাঙালি
তোরা ঢাকা শহর রক্তে ভাসাইলি।

মা-ও কান্দে, বাপ-ও কান্দে, কান্দে জোড়ের ভাই
বন্ধু বান্ধব কাইন্দা কয়, হায়রে খেলার সাথী নাই

ও বাঙালি..."

বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় এবং খ্যাতনামা গীতিকার এবং সুরকার আব্দুল লতিফের (১৯২৭-২০০৫) লেখায় উঠে আসে মাতৃভাষার জন্য এক দীর্ঘ প্রাণবন্ত গান।

জারির সুরের খুব সহজ ভাষায় এই গান যেন হৃদয়ের কথা বলে। প্রত্যেকটা মানুষের মনে যেন এই গান বাজে। আব্দুল লতিফের এই জারিতে বাংলার নানা ঐতিহ্য, নিসর্গ, সংস্কৃতির কথা তুলে ধরা হয়েছে। ফলে এ জারি হয়ে উঠেছে গণমানুষের অভিব্যক্তি। ভাষা আন্দোলনের গানের এই সার্বজনীন রূপ উত্তরকালে ছড়িয়ে যায় সবার মাঝে। মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা, বাঙালিকে স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করে।

"ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়।।
ওরা কথায় কথায় শিকল পরায় আমার হাতে-পায়ে।।
ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়।।
কইতো যাহা আমার দাদায়, কইছে তাহা আমার বাবায়।।
এখন কও দেহি ভাই মোর মুখে কি অন্য কথা শোভা পায়
কও দেহি ভাই..."

তারপর একে একে লিখলেন –

১) 'বুকের খুনে রাখলো যারা/ মুখের ভাষার মান/ ভোলা কি যায়রে তাদের দান?',

২) 'আমি কেমন কইরা ভুলি/ মুখের কথা কইতে গিয়া/ ভাই আমার খাইছে গুলি',

৩) 'রফিক-শফিক বরকত নামে/ বাংলা মায়ের দুরন্ত ক'টি ছেলে।/ স্বদেশের মাটি রঙিন করেছে/ আপন বুকের তপ্ত রক্ত ঢেলে',

৪) 'আবার এসেছে অমর একুশে/ পলাশ ফোটানো দিনে,/ এ দিন আমার ভায়েরা আমায় বেঁধেছে রক্তঋণে'।

উল্লিখিত সব ক'টি গানই তিনি রচনা করেছিলেন ১৯৫৩ থেকে ১৯৬৮ সালের মধ্যে। তখনো দেশটির নাম পাকিস্তান। পাকিস্তানিদের কড়া নজরের মধ্যে ভাষার আকুতিতে নিরন্তর গান বেঁধে যাওয়া আর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সেসব গেয়ে শোনানো মোটেও খুব সহজ কাজ ছিল না।

পরবর্তীতে ফজল-এ-খোদা রচনা করেন-

"সালাম সালাম হাজার সালাম
সকল শহীদ স্মরণে,
আমার হৃদয় রেখে যেতে চাই
তাদের স্মৃতির চরণে।।

মায়ের ভাষায় কথা বলাতে
স্বাধীন আশায় পথ চলাতে
হাসিমুখে যারা দিয়ে গেল প্রাণ
সেই স্মৃতি নিয়ে গেয়ে যাই গান
তাদের বিজয় মরণ..."

শিল্পী আব্দুল জব্বারের কণ্ঠের এই গান আজ প্রায় চার দশক ধরে শ্রোতাদের হৃদয় সিক্ত করছে। শহীদ স্মরণে এ গানের আবেদন কখনো ম্লান হবার নয়।

গানের কথার সঙ্গে সুরের আবেশ যুক্ত না হলে গানের পূর্ণ রূপ পরিস্ফুট হয় না। গান যেহেতু প্রায়োগিক শিল্প, কণ্ঠের গায়কী ভঙ্গি, বাদ্যযন্ত্রের তালের সমন্বয়ে তা পূর্ণতা লাভ করে। গানের স্পন্দমান কথা হৃদয়বীণায় এসে লাগে। কবি শামসুর রাহমানের লেখা একুশের একটি জনপ্রিয় গান-

"ফসলের মাঠে, মেঘনার তীরে
ধুধু বালু চরে, পাখিদের নীড়ে
তুমি আমি লিখি প্রাণের বর্ণমালা।।

সকালে দুপুরে, গোধূলী বেলায়
শত পুষ্পের নিবিড় মেলায়

shukhobor-february-2020.indd 14 2020-02-19 2:42 AM

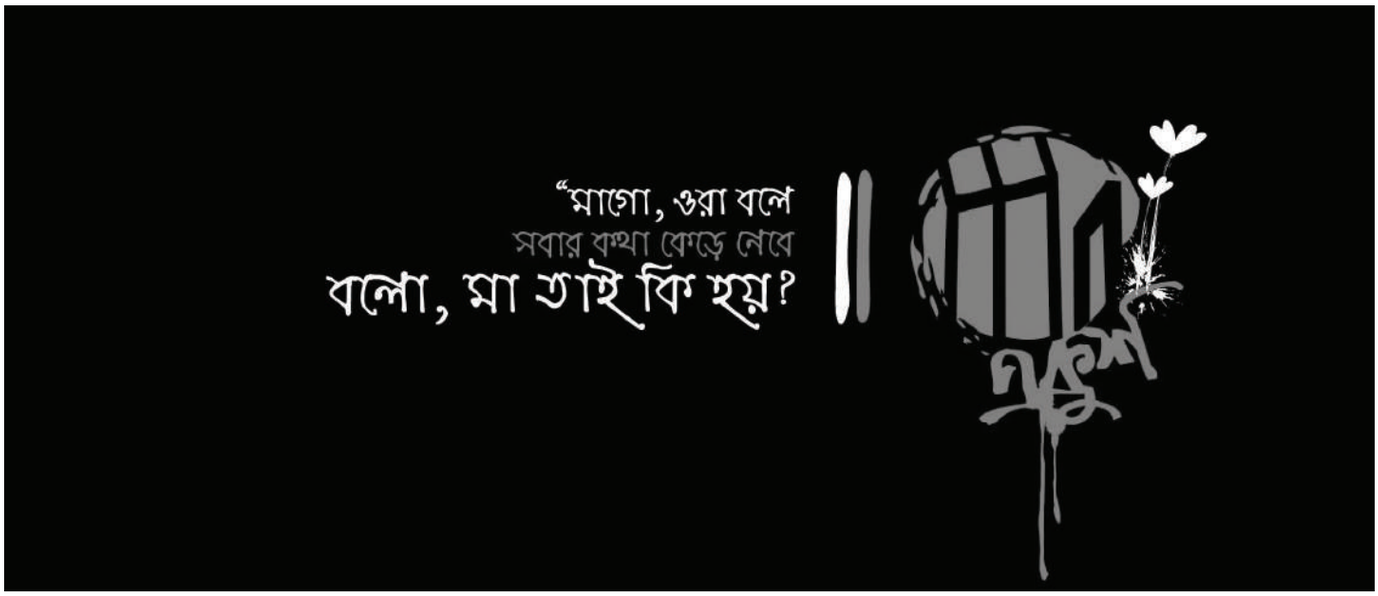

তুমি আমি লিখি প্রাণের বর্ণমালা।।"

১৯৫৫ সালে রচিত কলিয়াল রমেশ শীলের ভাষার গান-

"ভাষার জন্য জীবন হারালি বাঙালি ভাইরে
রমনার মাটি রক্তে ভাসালি
বাঙালিদের বাংলা ভাষা জীবনে মরণে
মুখের ভাষা না থাকিলে জীবন রাখি কেনে
কীট পতঙ্গ পশুপাক্ষী স্বীয় ভাষায় বুলি
তার থেকে কি অধম হলাম অভাগা বাঙালি।।"

শহুরে শিল্পীদের বাইরে গ্রামগঞ্জের কবিয়াল, বাউল, গায়েনদের মনেও ভাষা আন্দোলনের শোকাবহ স্মৃতি ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। তারা বাংলা ভাষার মানরক্ষায় শহীদদের আত্মদানের বিষয়টি নিয়ে কবিগান, জারি, গীতিকা রচনা করেছেন। পাঞ্জুসাহ, মহীন শাহ, সিলেটের শাহ আব্দুল করিম তাদের মধ্যে অন্যতম। শাহ আব্দুল করিমের গান-

"ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখে
সালাম বরকতের বুকে
গুলি চালায় বেঈমানে।।"

একুশের গানের কবি ও গীতিকারদের মধ্যে রয়েছেন: সত্যেন সেন, গাজীউল হক, জসীমউদ্দীন, হাসান হাফিজুর রহমান, নাজিম মাহমুদ, আলিমুজ্জামান চৌধুরী, আল মাহমুদ, শামসুর রাহমান, সিকান্দার আবু জাফর, সিরাজুল ইসলাম, কাজী লতিফা হক, নরেন বিশ্বাস, দিলওয়ার, গাজী মাজহারুল আনোয়ার, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান, আবিদ আনোয়ার, বদরুল হাসান, জাহিদুল হক, নাসির আহমেদ, মতলুব আলী, শাফাত খৈয়াম, মুহাম্মদ মুজাক্কের, এস এম হেদায়েত, আজাদ রহমান, নজরুল ইসলাম বাবু, আবুবকর সিদ্দিক, সৈয়দ শামসুল হুদা, ফজল-এ-খোদা, হামিদুল ইসলাম, মুন্সী ওয়াদুদ, তোফাজ্জল হোসেন, ইন্দু সাহা, হাবীবুর রহমান, আসাদ চৌধুরী, জেব-উন্-নেসা জামাল, মাসুদ করিম, আজিজুর রহমান, আজিজুর রহমান আজিজ, কে জি মোস্তফা, আবদুল হাই আল হাদী, নুরুজ্জামান শেখ প্রমুখ।

একুশের গানে সুরারোপ করেছেন: আলতাফ মাহমুদ, আবদুল লতিফ, মোমিনুল হক, নিজাম উল হক, সমর দাস, সত্য সাহা, সাধন সরকার, আজাদ রহমান, আবদুল আহাদ, শেখ লুৎফর রহমান, খোন্দকার নূরুল আলম, অজিত রায়, লোকমান হোসেন ফকির, আবদুল জব্বার, খান আতাউর রহমান, প্রশান্ত ইন্দু, রমেশ শীল, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, কবিয়াল ফণী বড়ুয়া, আবেদ হোসেন খান, দেবু ভট্টাচার্য, বশির আহমেদ, রাম গোপাল মোহান্ত, সুখেন্দু চক্রবর্তী, হরলাল রায় প্রমুখ। তবে কবি, গীতিকার ও সুরকারদের নামের তালিকা অনেক ব্যপ্ত, তা শুধু লেখার আঙ্গিকে সমাপ্ত করা অসাধ্যই বটে।

ভাষার প্রতি ভালবাসা, মমত্ববোধ, আন্তরিকতা এসব আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। মায়ের ভাষার প্রতি আকুতির এক অপরূপ দৃষ্টান্ত আমাদের এই অমর একুশ। ভাষার জন্য অকুতোভায় বাঙালি কী করে নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছে, তা আজ আর কারও অজানা নয়। ইউনেস্কো ও জাতিসংঘের বদৌলতে এই দিনটি আমরা ভাগ করে নিয়েছি পুরো বিশ্বের সাথে।

আমাদের গৌরব, আমাদের অহংকারে পৃথিবীর সকল দেশ আজ একীভূত। পশ্চিম আফ্রিকার একটি দেশ 'সিয়েরা লিওন' তো বাংলা ভাষাকে সম্মানা-জ্ঞাপনে তাদের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করেছে। আমাদের এই দেশটি খুব ছোট। কিন্তু আমাদের গর্জন অনেক ব্যপ্ত। সেই গর্জনের অনেক প্রাপ্তি যা আজও পৃথিবীকে অবাক করে দেয়। আর সে দেশের মধুর বোল আমাদের গৌরব, আমাদের অহংকার আমাদের বাংলা ভাষা। অতুল প্রসাদ সেনের মুখে-

"মোদের গরব, মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা।।
মাগো তোমার কোলে, তোমার বোলে, কতই শান্তি ভালবাসা।।
আ মরি বাংলা ভাষা।
মোদের গরব, মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা।।
কি যাদু বাংলা গানে- গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে,
গেয়ে গান নাচে বাউল- গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।
মোদের গরব, মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা।।"

সূত্র:
1. bn.wikipedia.org/wiki/ekushergan
2. http://www.jaijaidinbd.com
3. http://www.prothom-alo.com
(সংকলিত)

shukhobor-february-2020.indd 15 2020-02-19 2:42 AM

প্রতি মাসের সুখবর

ফিচার

প্রথম শহীদ মিনার ও একজন পিয়ারু সরদার

পিয়ারু সরদার। জন্ম ১৮৯৩ সালে। ১৯৪৪ সালে পিতা মুন্নু সরদারের মৃত্যুর পর স্বাভাবিক রেওয়াজ অনুযায়ী তাকে পাগড়ি পরিয়ে সরদার উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৯৬১ সালে ৬৮ বছর বয়সে ইন্তেকালের আগপর্যন্ত তিনি সরদারি দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন হোসনি দালান, বকশিবাজার, নাজিমউদ্দিন রোড, উর্দু রোড, নূরকাতা লেন, আজিমপুর, পলাশীসহ বিভিন্ন মহল্লার সরদার। দানশীল ও শিক্ষানুরাগী হিসেবে তার খ্যাতি দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। একবার তিনি ঢাকা পৌর করপোরেশন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেণ, এবং বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করে কমিশনার নির্বাচিত হন।

সরদারির পাশাপাশি ব্রিটিশ আমলের শেষদিকে এসে পিয়ারু সরদার ঠিকাদারি ব্যবসাতেও মনোনিবেশ করেন। পাকিস্তান আমলে তিনি পরিণত হন একজন প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদারে। তার তত্ত্বাবধায়নেই নির্মিত হয়েছিল ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশন মিলনায়তন এবং রমনা পার্ক। এছাড়াও রানী এলিজাবেথের জন্য তিনি নির্মাণ করেছিলেন পার্কের বিশাল মঞ্চটি, যা আজ শতায়ু মঞ্চ নামে পরিচিত।

মন্ত্রিপাড়ার বেশ কিছু ভবন নির্মাণের সাথেও জড়িত ছিলেন পিয়ারু সরদার। কেউ কেউ মনে করেন, ঢাকা স্টেডিয়াম নির্মাণের দায়িত্বে ছিলেন যে কয়জন ঠিকাদার, তাদের মধ্যে একজন ছিলেন তিনি। এছাড়াও নারায়ণগঞ্জের আদমজি জুটমিল, মোহাম্মদপুরের রিফিউজি কলোনি, আসাদগেট, ঢাকা মেডিকেল কলেজের নার্সিং হোস্টেল প্রভৃতি নির্মাণকাজেরও ঠিকাদার ছিলেন তিনিই।

কথিত আছে, ঢাকায় রানী এলিজাবেথের আগমনের প্রাক্কালে শহরটিকে তিলোত্তমা করে সাজানোর উদ্দেশ্যে দ্রুততম সময়ের মধ্যে তেজগাঁও বিমানবন্দর থেকে লাটভবন (বর্তমান বঙ্গভবন) পর্যন্ত নতুন রাস্তা নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। আপাত অসম্ভব সেই কাজটিও সম্ভব হয়েছিল পিয়ারু সরদারে কর্মতৎপরতায়ই। অনেকেই জেনে অবাক হবেন, এখনও যে ঢাকার ঈদগাহের নামাজের প্যান্ডেল নির্মিত হয়, সেটির পেছনে রয়েছে পিয়ারু সরদার অ্যান্ড কোং-এর অবদান।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে অবদান

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি মায়ের ভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করবার দাবিতে বুকের রক্ত ঢেকে রাজপথ রাঙিয়েছিলেন সালাম, রফিক, শফিউর, বরকত, জব্বারসহ নাম-না-জানা আরো অনেকেই। কিন্তু ২১ ফেব্রুয়ারির আগে-পরে এমন অনেকেই আছেন যারা হয়তো সরাসরি ভাষা আন্দোলনে প্রাণ দেননি, সর্বসম্মুখেও আসেননি, কিন্তু অন্তরালে থেকে এই আন্দোলনকে পৃষ্ঠপোষকতা করে গেছেন, যথাসম্ভব অবদানের মাধ্যমে আন্দোলনকে বেগবান করেছেন। সেরকমই একজন ছিলেন পিয়ারু সরদার।

১৯৫২ সালে ভাষার দাবিতে গোটা ঢাকা শহর যখন উত্তাল হয়ে ছিল, তখন পিয়ারু সরদার ছিলেন নগরীর ২২ পঞ্চায়েত প্রধানের মধ্যে একজন। তার বাড়ির অদূরেই ছিল রেললাইন, আর তার অপরপাশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের আমতলা। তার বাড়ির ছাদে উঠলেই টের পাওয়া যেত, আমতলায় কী হচ্ছে না হচ্ছে। আর যেহেতু তখনকার সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপ্লবী ছাত্রছাত্রীদের কর্মসূচির কেন্দ্রস্থল ছিল

পিয়ারু সরদার'

প্রথম শহীদ মিনার

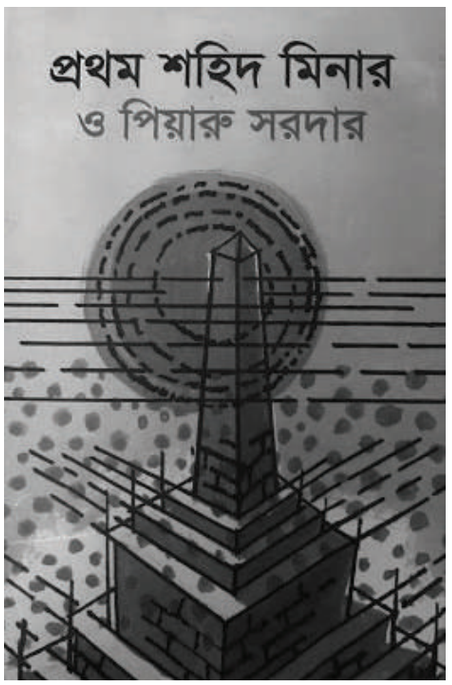

আনিসুজ্জামানের সম্পাদনায় বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ 'প্রথম শহীদ মিনার ও পিয়ারু সরদার'

shukhobor-february-2020.indd 16 2020-02-19 2:42 AM

আমতলা, তাই তার বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে চলমান আন্দোলনের হাল-হকিকতও বুঝে নেয়া যেত বেশ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল ছাত্রসমাজের আন্দোলন একসময় বিস্তার লাভ করে পিয়ারু সরদারের হোসনি দালান ও বকশিবাজার এলাকা পর্যন্তও। এই এলাকাগুলো আরো পরিণত হয় আন্দোলনরত ছাত্রদের আশ্রয়স্থলে। যখনই পুলিশ ছাত্রছাত্রীদের উপর হামলা চালাত, তারা চট করে রেললাইন পার হয়ে ঢুকে পড়ত হোসনি দালান মহল্লায়। পুলিশ তাদের পিছু নিয়ে ওই মহল্লায় ঢুকেও টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করত, যা গোটা এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে পড়ত। এমতাবস্থায় ছাত্রদের পানি সরবরাহ করে তাদের চোখের জ্বালা কমানোর উদ্দেশ্যে বাসায় বালতি করে পানির জোগাড় রাখতেন স্বয়ং পিয়ারু সরদার। তার দেখাদেখি এই কাজ করত মহল্লার আরো অনেকেই। এভাবে প্রগতিশীল ছাত্রসমাজের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল পিয়ারু সরদারের মহল্লাবাসীরও।

২১ ফেব্রুয়ারি যখন ছাত্রসমাজ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করে এবং আন্দোলনে মুখর হয়ে ওঠে, তখন তাদের উপর নির্বিচারে গুলি চালায় পুলিশ। অনেকে তো নিহত হনই, এছাড়াও গুরুতর আহত হন বা বন্দি হন আরো শত শত আন্দোলনকারী। সব মিলিয়ে দেশ যখন এক মহাক্রান্তিকাল অতিক্রম করছিল, তখন নিজ দেশপ্রেমের পরিচয় দিতে এগিয়ে আসেন পিয়ারু সরদার।

প্রথম শহীদ মিনার নির্মাণ

২১ ফেব্রুয়ারির পরদিনই ছাত্ররা মনস্থির করেন যে তারা ভাষা শহীদদের স্মরণে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করবেন। ঠিক যে জায়গাটায় পুলিশ আন্দোলনকারীদের উপর গুলি চালিয়েছিল, সেখানেই 'শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ' নামখচিত একটি স্মৃতির মিনার নির্মিত হবে। এ লক্ষ্যে সেদিনই বদরুল আলম তৈরি করেন মিনারটির নকশা। কিন্তু মিনার তৈরি করতে হয় নগদ অর্থ লাগবে, নয়তো লাগবে কাঁচামাল। ছাত্রদের কাছে সে সময়ে কিছুই ছিল না। তাহলে উপায়? ছাত্রদের মাথায় তখন প্রথম যে নামটি এলো, সেটি হলো পিয়ারু সরদার।

ঐ সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজ ভবনের সম্প্রসারণের কাজ চলছিল, যার ঠিকাদারি করছিলেন পিয়ারু সরদার। সেখানে কাজের জন্য যে পরিমাণ বালু ও ইট মজুদ ছিল, তা দিয়ে অনায়াসেই কাজ চলে যেত, কিন্তু সবচেয়ে জরুরি যে সিমেন্ট, তা রাখা ছিল তালাবদ্ধ গুদামে। গুদামের চাবি ছিল কেবল পিয়ারু সরদারের কাছেই। ছাত্ররা ধরেই নিয়েছিল, পিয়ারু সরদারের কাছে সিমেন্টের আবদার করা হলেও তা রাখবেন না তিনি। কিংবা বলা ভালো, রাখা সম্ভব নয় তার পক্ষে, কেননা সরকারি সিমেন্ট তিনি 'সরকারবিরোধী' কাজে দান করে দিয়েছেন, এ কথা জানাজানি হলে আর রক্ষে ছিল না।

তারপরও ঢাকা মেডিকেল কলেজের দুই ছাত্র দুরু দুরু বুকে হাজির হলেন পিয়ারু সরদারের কাছে, পেশ করলেন নিজেদের দাবি। তাদের কথা শুনে সহসাই কোনো জবাব দিলেন না তিনি। নিঃশব্দে বাড়ির ভিতর ঢুকে গেলেন। যখন ফিরে এলেন, তখন তার হাতে একটি চাবি। ছাত্রদের হাতে চাবিটি তুলে দিতে দিতে শুধু বললেন, "কাজ শেষ করে পরদিন অবশ্যই চাবিটি ফেরত দিয়ে যেয়ো।"

এভাবেই বড় ধরনের বিপদের মুখে পড়ার আশঙ্কা থাকলেও, সেসবের পরোয়া না করে ছাত্রদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন পিয়ারু সরদার। তার কল্যাণেই জোগাড় হয়ে যায় মিনার নির্মাণের ইট, বালু, সিমেন্ট। তখনো ঢাকায় কারফিউ জারি ছিল। সেই কারফিউয়ের ভেতরই যথাসম্ভব নীরবে, শত শত স্বেচ্ছাসেবীর পরিশ্রমে ২৩ ফেব্রুয়ারি সারারাত জেগে নির্মিত হয় ভাষা শহীদদের স্মরণে প্রথম শহীদ মিনার। ৬ ফুট চওড়া ও ১০ ফুট উচ্চতার সেই মিনারটি ছিল শক্ত ভিতের উপর নির্মিত। মিনারের গায়ে সেঁটে দেয়া হয়েছিল দুটি পোস্টার, মধ্যভাগে লেখা হয়েছিল 'শহীদ স্মৃতি অমর হোক' আর নীচের দিকে লেখা হয়েছিল 'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই'।

২৪ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টার দিকে শহীদ শফিউর রহমানের পিতা এসে সেই শহীদ মিনারের স্মৃতিফলক উন্মোচন করলে, সেখানে ঢল নামে আবেগাপ্লুত হাজারো মানুষের। সবাই ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে থাকে ভাষা আন্দোলনের অমর শহীদদের। মেয়েরা ফুলের পাশাপাশি নিজেদের শরীর থেকে গহনা খুলে নিবেদন করতে থাকে শহীদ মিনারের পাদদেশে। এছাড়া অনেকে নগদ টাকাও রাখে।

দুঃখের বিষয়, এত পরিশ্রমের মাধ্যমে নির্মিত শহীদ মিনারটির স্থায়িত্বকাল খুব বেশিদিন ছিল না। ২৬ ফেব্রুয়ারিই পাকিস্তানি শোষকদের নির্দেশে ভেঙে ফেলা হয় শহীদ মিনারটি। পরে ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর আবারো নির্মাণ করা হয় শহীদ মিনার। এবারের শহীদ মিনারটির আকার ছিল আরো বড়। এবং সেটি নির্মিত হয়েছিল খোদ পিয়ারু সরদার ও তার নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়নে। অবশ্য ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পাকবাহিনী আবারও কামান দেগে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল শহীদ মিনারটি।

শেষ কথা

বলাই বাহুল্য, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ও তৎপরবর্তী সময় কতটা অবদান ছিল পিয়ারু সরদারের। তবে তার অবদান শুধু এটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়। পাকিস্তান আমলের প্রগতিশীল ছাত্র রাজনীতির তিনি ছিলেন একজন বিশাল বড় পৃষ্ঠপোষক। ৬০'র দশকের শুরুতে ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় অফিস ছিল ৩১/১ হোসনি দালান রোডে। ছাত্র ইউনিয়নের অফিসের জন্য এই এলাকাটি শুধু এজন্যই বেছে নেয়া হয়নি যে এর অবস্থান ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও মেডিকেল কলেজ থেকে খুব কাছে, পাশাপাশি এজন্যও যে এখানে অফিস নির্মাণ করলে পাওয়া যেত পিয়ারু সরদারের প্রটেকশন লাভের সুবিধা। এই এলাকায় তার প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল এতটাই যে, আয়ুব-মোনায়েমের পেটোয়া বাহিনী বা প্রতিক্রিয়াশীলরাও সাহস পেত না এখানে এসে দাপট দেখানোর।

মৃত্যুর পর দীর্ঘদিন যেন বিস্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে ছিলেন পিয়ারু সরদার। ভাষা আন্দোলনকে বেগবান করতে এতটা অবদান রাখার পরও তাকে স্মরণ করা হতো কালেভদ্রে। বর্তমান প্রজন্মের অনেকে তো তার নাম জানেই না। কারণ অনেকদিন পেরিয়ে গেলেও কোনো আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পাননি তিনি। তবে দেরিতে হলেও, ২০১৫ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তাকে মরণোত্তর একুশে পদক প্রদান করেন।

শেষ করা যাক পিয়ারু সরদার স্মরণে প্রয়াত সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক রচিত এই পংক্তিগুলোর মাধ্যমে,

অশ্রুমেশা আমাদের সেই প্রথম শহিদ মিনার
যদিও আজ দাঁড়িয়ে নেই আর,
বর্তমানের মিনারেই তো রয়েছে স্মৃতি তার
আর স্মৃতিতে আজও আছেন পিয়ারু সরদার!
পুরান ঢাকার নতুন দিনের যে মানুষটিকে পাই
ভুলেছি তাঁকে ? –পিয়ারু ভাই, আপনাকে ভুলি নাই!

(সংকলিত)

shukhobor-february-2020.indd 17 2020-02-19 2:42 AM

প্রতি মাসের সুখবর

বিজ্ঞান

ভাষার উৎপত্তি হল যেভাবে

ভাষার প্রচলন কীভাবে হলো সেটা নিয়ে অনেক গল্প আছে। এরকম বিখ্যাত গল্পগুলোর একটি আমরা প্রায় সবাই সম্ভবত ছোটকালে পড়েছি বা শুনেছি। তবে এই গল্পটা সরাসরি ভাষার উৎপত্তি নিয়ে না, বরং বিভিন্ন ভাষার উৎপত্তি নিয়ে।

গল্প মতে, প্রাচীন ব্যবিলনের মানুষ ভেবেছিল একটা টাওয়ার বানাবে। সেই টাওয়ার দিয়ে ছুঁয়ে ফেলবে আকাশ। মানুষ ভাবত, নীল আকাশের ওপারেই স্রষ্টার বাস। তাই টাওয়ার বানালে স্রষ্টার কাছে সরাসরি পৌঁছানো যাবে, কথা বলা যাবে। কিন্তু টাওয়ারের কাজ অনেক দূর হওয়ার পরে স্রষ্টা ভাবলেন, এভাবে তো চলতে দেওয়া যায় না!

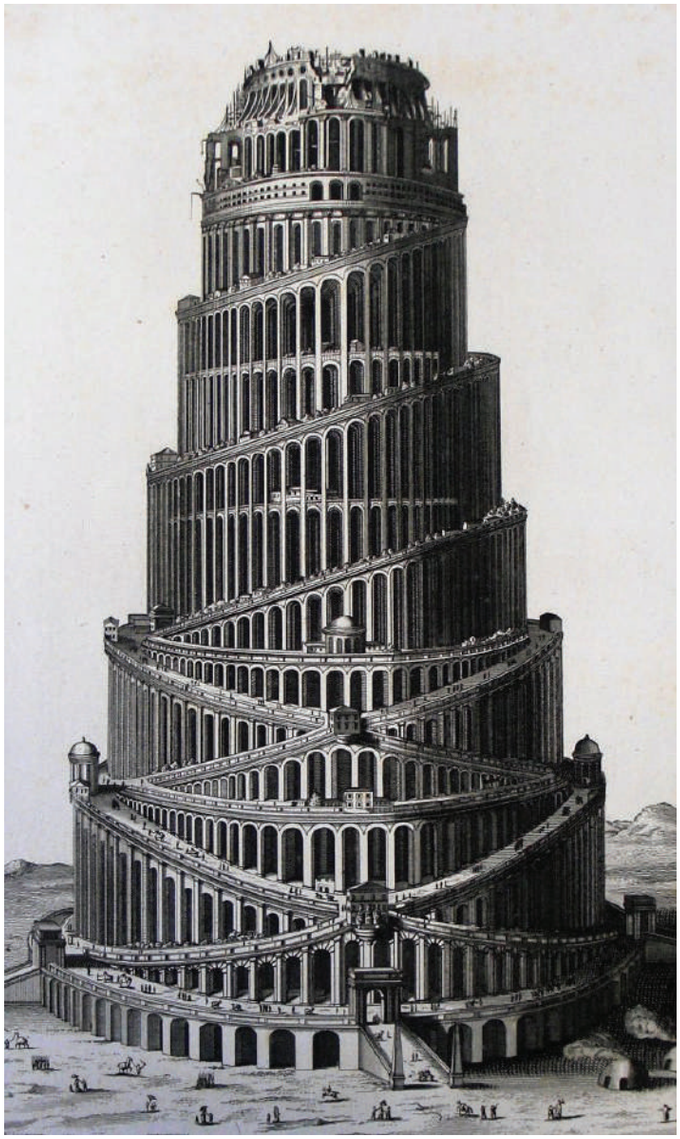

শিল্পির চোখে টাওয়ার অফ ব্যাবিলন; Image Source: Phillip Medhurst

একদিন লোকজন ইট-পাথর আনতে গিয়েছিল। টাওয়ারের কাছে এসে ওরা টের পেল, কেউ আর কারো কথা বুঝতে পারছে না। স্রষ্টা আসলে একেকজনকে একেক ভাষা শিখিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু কেউ কথা না বুঝলে টাওয়ারের কাজ কীভাবে এগোবে! ভেস্তে গেল টাওয়ার বানানো। স্রষ্টা আকাশের ওপারে অধরাই রয়ে গেলেন। আর এদিকে, মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ল নানা ধরনের ভাষা।

এই গল্পের অনেক ফাঁক-ফোঁকর আছে। চাইলেই গল্পটা নিয়ে নানারকম প্রশ্ন করা যায়। কিন্তু সেসব প্রশ্ন করা আমাদের উদ্দেশ্য না। আমাদের উদ্দেশ্য হলো, এই ব্যাপারটাকে তলিয়ে দেখা। বুঝতে চেষ্টা করা, আসলেই ঠিক কী হয়েছিল। তবে এই কাজটা আমরা করব বিজ্ঞানের চোখে, তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে।

সেজন্য অবশ্যই আমাদের ফিরে যেতে হবে প্রাচীন পৃথিবীতে। যে পৃথিবীর কথা ঘুরে ফিরে এসেছে মানুষের ইতিহাসে, কল্পে-গল্পে।

দুই

কথা হলো, আমরা কি শুরু থেকেই শুরু করব? চট করে ফিরে যাব সেই পৃথিবীতে? ভাবার চেষ্টা করব, সে সময়ের মানুষ তখন কী করছিল? উঁহু, সেটা করা যাবে না। যুক্তি আমাদের বলে, উল্টো দিক থেকে পুরো জিনিসটা দেখার চেষ্টা করতে হবে আমাদের। ধীরে ধীরে তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে ফিরে যেতে হবে সেই সময়টায়, যখন ভাষার শুরু হয়েছিল।

কথা হলো, বিজ্ঞানীরা এটা কীভাবে করেন? মানে, ভাষা তো আর ফসিল রেখে যায়নি যে, ফসিল বিশ্লেষণ করে, কার্বন ডেটিং করে এর ইতিহাস বের করে ফেলা যাবে। কথা সত্য। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষদের দেহের গঠণ বিশ্লেষণ করলে সেটা দেখা যায় যে, ধীরে ধীরে তারা যোগাযোগের দিকে ঝুঁকছে। তাদের দেহে সেই চিহ্ন ফুটে উঠছে ধারাবাহিকভাবে। সেই সঙ্গে তাদের রেখে যাওয়া বিভিন্ন জিনিসেও আমরা এর ছাপ দেখতে পাই। এসব সূত্র ধরে ধরেই বিজ্ঞানীরা ভাষার শুরুর গল্পটা বোঝার চেষ্টা করেছেন।

আগেই বলেছি, যা করার তা করতে হবে উল্টোভাবে। এই হিসেবে, প্রথম প্রমাণটা পাওয়া যায় মানুষের লেখালেখির। যে লিখতে পারে, সে যে ভাষা পারবে, সেটা তো আর আলাদা করে বলে দেওয়ার দরকার নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, মানুষের লেখার ইতিহাসের সূচনা হয়েছে মাত্র কয়েক হাজার বছর আগে। তার মানে, এটা আমাদের খুব বেশি দূরে নিয়ে যেতে পারে না। সেজন্য উনিশ শতকের বিজ্ঞানীরা ভেবেছিলেন, ভাষার উৎপত্তি বের করা মানুষের সাধ্যের বাইরে। শুধু ভেবেই ক্ষান্ত দেননি। ১৮৬৬ সালে প্যারিস ল্যাঙ্গুইস্টিক সোসাইটি এ বিষয় নিয়ে আলোচনা-গবেষণাও নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। উঁহু, গবেষণা করলে পাপ হবে, এমন না। ওদের মনে হয়েছিল, এই নিয়ে কাজ করাটা কেবলই সময় নষ্ট।

আশার কথা হলো, সময় বা অর্থ নষ্ট হবে ভেবে কৌতূহলী মানুষ কখনোই থেমে যায়নি। সেজন্যেই মানুষ চাঁদে পা রাখতে পেরেছে। মানুষের হাতে গড়া মহাকাশযান পেরিয়ে গেছে সৌরজগতের সীমানা। একইভাবে একশ বছরের মতো পরে এসে জীববিজ্ঞানী ও ইভোলিউশনারি থিওরিস্টরা ভাবলেন, এভাবে তো ভাষাকে ফেলে রাখার কোনো মানে হয় না। আমাদের জীবন ও সভ্যতার এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ইতিহাস জানতে হবে। সেজন্য কাজে নামা দরকার। কিন্তু কীভাবে?

shukhobor-february-2020.indd 18 2020-02-19 2:42 AM

ফসিল নেই, নেই যথেষ্ট সূত্র। লেখালেখিও শুরু হয়েছে অল্প কিছুদিন আগে। তাহলে উপায়? বিজ্ঞানীরা ভাবেন। ভেবে ভেবে তারা সেই আপ্ত বাক্যের কাছে ফিরে গেলেন। দশে মিলে করি কাজ, হারি-জিতি নাহি লাজ! শুধু জীববিজ্ঞানের হাত ধরে হয়তো হবে না। কিন্তু বিজ্ঞানের বাকি সব শাখা আছে কী করতে? শেষমেষ প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ভাষা বিজ্ঞান ও কগনিটিভ সায়েন্স- সব কিছু একসঙ্গে নিয়ে মাঠে নামলেন বিজ্ঞানীরা। অবশেষে ফল পাওয়া গেল। এর মধ্যে দিয়ে শুধু একটি নয়, মানুষের ভাষা খুঁজে পাওয়া নিয়ে দু-দুটো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান মিলে গেল একসঙ্গে।

তিন

চল্লিশ হাজার বছর আগের কথা। মানুষ তখন গুহাচিত্র আঁকত। এ ধরনের ছবি আমরা দেখেছি। সেসব ছবির পেছনে চিন্তা, সংস্কৃতি ও বিমূর্ত ভাবনা ছিল, এটা আমরা বুঝতে পারি। ভাষার জন্যে তো ঠিক এই জিনিসগুলোই দরকার, তাই না? তাহলে, কয়েক হাজার বছর থেকে চল্লিশ হাজার বছর পর্যন্ত পিছিয়ে এলাম আমরা। কথা হলো, এই সময়েই কি ভাষার আবির্ভাব হয়েছিল?

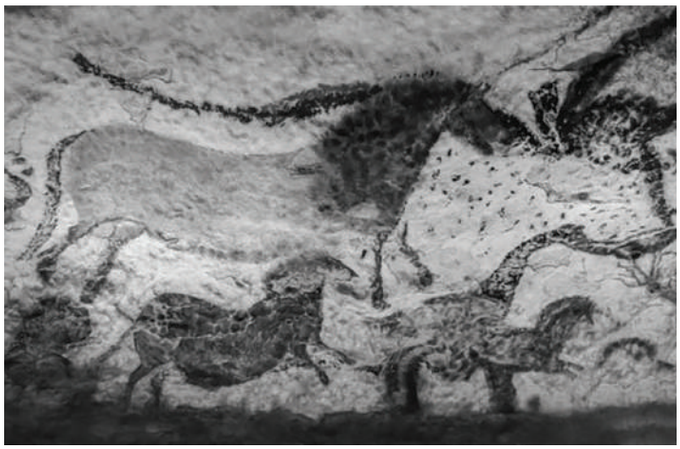

প্রাচীন মানুষের আঁকা গুহাচিত্র; Image Source: frontiersin.org

হতে পারে। না-ও হতে পারে! সহজ কথায়, সবই ঠিক আছে, কিন্তু এককভাবে এই ব্যাখ্যাটি যথেষ্ট না। অর্থাৎ আরো প্রমাণ দরকার। সেজন্যে আমরা সে সময়ের মানব-সমাজের দিকে তাকাতে পারি।

এ সব মিলে ধরে নেওয়া যায়, মানুষের মাঝে ভাষার উদ্ভব হয়েছিল চার লাখ বছর আগে।

মানুষের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখব, চল্লিশ হাজার বছর আগে মানুষ কিন্তু এক জায়গায় নেই। গোত্র বা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে নানাদিকে ছড়িয়ে গেছে। তার মানে, এই সময়ে যদি ভাষার উৎপত্তি হয়, তাহলে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় একইসঙ্গে বা অল্প সময়ের ব্যবধানে সব মানুষদের মধ্যে কিছু পরিবর্তন আসতে হবে। চিন্তার ক্ষমতা তৈরি হলেই শুধু হবে না, সেটা প্রকাশের মানসিক ও শারীরিক ক্ষমতা এবং সেজন্য দেহে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনও হতে হবে। এ থেকে আমরা একটা যৌক্তিক সিদ্ধান্তে আসতে পারি।

মানুষ নিশ্চয়ই আরো আগেই ভাষা শিখে গিয়েছিল। সেজন্যই তারা বিমূর্ত চিন্তা করতে শিখেছে এবং সেসব গুছিয়ে আঁকতে শিখেছে গুহার দেয়ালে। তাহলে কী দাঁড়াল ব্যাপারটা? তখনকার পৃথিবীতেও ভাষা ছিল, হয়তো বিভিন্ন গোত্র বা দলের মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলত; কিন্তু উৎপত্তিটা তখন হয়নি। হয়েছে আরো আগে, আরো অনেক আদিম পৃথিবীতে।

চার

আদিম পৃথিবীতে মানুষের আগেই এসেছিল এপরা। এই এপদের গলায় বড় আকারের বায়ুথলী ছিল। এটা দিয়ে তারা 'গোঁ গোঁ' ধরনের শব্দ করে প্রতিপক্ষ বা অন্যান্য প্রাণীকে ভয় দেখাত। সমস্যা হচ্ছে, এ ধরনের বায়ুথলী স্বরবর্ণের উচ্চারণে বাধা দেয়। এটা কিন্তু বিজ্ঞানীরা ইচ্ছেমতো বলে দেননি। বেলজিয়ামের ফ্রি ইউনিভার্সিটি অফ ব্রাসেলসে বিজ্ঞানী বার্ট দ্য বোর সিমুলেশন করে দেখিয়েছেন। কিন্তু মানুষের ভাষার পেছনে স্বরবর্ণ, যাকে বলে, আবশ্যক।

এপদের মধ্যে এ ধরনের বায়ুথলী ছিল ঠিকই, কিন্তু হোমো হাইডেলবার্জেনিস প্রজাতীর দেহে এরকম কিছু দেখা যায় না। এই হোমো হাইডেলবার্জেনিস থেকেই পরে নিয়ান্ডারথাল ও স্যাপিয়েন্সরা এসেছে বলে ধারণা করেন বিজ্ঞানীরা। হোমো হাইডেলবার্জেনিস পৃথিবীতে ছিল প্রায় সাত লাখ বছর আগে। অর্থাৎ এ সময় পৃথিবীতে ভাষা না থাকলেও, ভাষা তৈরি হওয়ার বেশ কিছু প্রয়োজনীয় উপাদান ততদিনে চলে এসেছে।

আধুনিক মানুষের কথা যদি ভাবি, মস্তিষ্ক থেকে মেরুদণ্ড হয়ে অনেক

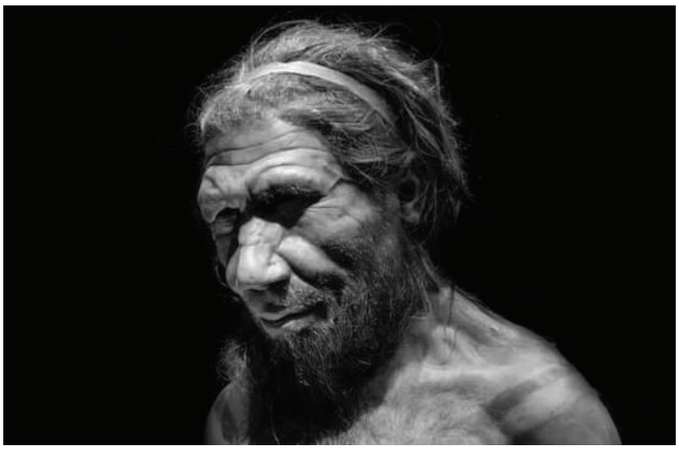

নিয়ান্ডারথাল; Image Source: theguardian.com

অনেকগুলো স্নায়ু ডায়াফ্রাম এবং পাঁজরের মধ্যকার পেশীতে এসে যুক্ত হয়েছে। ঠিকভাবে শ্বাস নিয়ন্ত্রণ ও যথার্থ শব্দ করার জন্য এগুলো জরুরি ভূমিকা রাখে। এই একই জিনিস নিয়ান্ডারথালদের মধ্যেও দেখা যায়।

এই দুই প্রজাতির কানের ভেতরের অংশেও একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা যায়। ফলে, মানুষের উচ্চারিত শব্দের কম্পাংকের যে পরিসীমা আছে- এই সীমায় প্রজাতি দুটির কানের ভেতরে দারুণ সংবেদনশীলতা তৈরি হয়েছে। কথা বলার জন্য শোনা ও এর ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বোঝাটা জরুরি। এটার খুব সহজ একটা উদাহরণ আমরা বর্তমানেই দেখতে পারি। যারা কথা বলতে পারেন না, তারা কানেও শুনতে পান না। কারণ, শুনে সেটা প্রকাশ না করতে পারলে, এই ভার মস্তিষ্ক নিতে পারবে না। আবার, না শুনলে বলার জন্য প্রয়োজনীয় সক্ষমতা তৈরি হওয়া একরকম অসম্ভব।

এরপরেও, কথা বলার জন্য আরেকটা জিনিস দরকার। FOXP2 জিন। মস্তিষ্কের যে অংশ কথা নিয়ন্ত্রণ করে, সেখানে কারিকুরি ফলায় এটি। অনেক স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যেই এটা থাকে। কিন্তু মানুষের ভেতরে এই জিনটি কিছুটা উন্নত। সেজন্যই আমরা মুখ ও চেহারায় ভাষার জন্য প্রয়োজনীয় নড়াচড়াগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। নিয়ান্ডারথালদের মধ্যেও এই জিন ছিল, কিন্তু এতটা উন্নত ছিল না।

এসব তথ্য আমাদেরকে একটা সময়ের দিকে ইঙ্গিত করে। এ থেকে

shukhobor-february-2020.indd 19 2020-02-19 2:42 AM

বলা যায়, মোটামুটি চার লাখ বছর আগে পৃথিবীতে ভাষার উৎপত্তি হয়েছিল। ততদিনে মানুষ নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রয়োজনীয় শারীরিক সক্ষমতা চলে এসেছে তার ভেতরে। ধীরে ধীরে চিন্তার ক্ষমতাও বাড়ছে। সেজন্যই এই ভাবনাগুলো প্রকাশ করা জরুরি হয়ে গেছে। ফলে তৈরি হয়েছে ভাষা।

কিন্তু আরো আগে, প্রায় দুই মিলিয়ন বছর আগে হোমো ইরেক্টাসরা যখন শিকার করত, তখন তারা নানারকম যন্ত্র বানাত সেজন্যে। তাহলে তারাও কি ভাষা জানত? হয়তো জানত। হয়তো জানত না। কিন্তু সেই ভাষা যে আধুনিক মানুষের ভাষা ছিল না, এ ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা মোটামুটি নিশ্চিত। মানুষের ভাষার আদিম রূপ, হয়তো ঠিক ভাষা হয়েও ওঠেনি- এমন কিছু থাকলেও থাকতে পারে সে সময়।

এই প্রশ্নের তিনটি সম্ভাব্য উত্তর আছে। প্রথম উত্তরটা দিয়ে গেছেন চার্লস ডারউইন। ভদ্রলোক বলেছিলেন, বিভিন্ন প্রাণীকে সঙ্গী নির্বাচনের কৌশল হিসেবে অদ্ভুত সব কাজকর্ম করতে দেখা যায়। মানুষও সেরকম কিছু করতে চাইত। এর ফলে প্রোটোল্যাঙ্গোয়েজ বা 'আদিভাষা' ধরনের একটা কিছু একটা গড়ে ওঠে। অবশ্য, এই আদিভাষার সরাসরি কোনো অর্থ ছিল না। যেমন- পাখিদের ডাক।

পুরুষরা সেই আদিভাষা ব্যবহার করে নারীদের আকর্ষণ করতে চাইত। প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যাওয়ার জন্য তারা আদিভাষা নিয়ে আরো ভাবতে থাকে, এবং আরো জটিল ও সুমধুর কোনো ধ্বনি প্রকাশের চেষ্টা করতে থাকে। এভাবেই ভাষা গড়ে ওঠে। ডারউইন উদাহরণ হিসেবে গিবনদের কথা বললেন। এই প্রাইমেটরাও এভাবে গেয়ে গেয়ে নারী গিবনদের আকৃষ্ট করতে চায়। কেউ কেউ পরে এই অনুমানের ওপরে

ভাষার উৎপত্তির সময়কাল

এ সব মিলে ধরে নেওয়া যায়, মানুষের মাঝে ভাষার উদ্ভব হয়েছিল চার লাখ বছর আগে। আর, সেই ভাষাই দিনে দিনে আরো পরিণত হয়েছে। আবার, মানুষ দল বা গোত্রে ভাগ হয়ে যাওয়ার ফলে বিকৃত হয়ে গেছে ভাষা। সেভাবেই তৈরি হয়েছে নানা ধরনের এত সব ভাষা। কিন্তু যতই আলাদা হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি না কেন, ভালোভাবে খুঁজলে আজও আমরা ভিন্ন ভিন্ন ভাষার মধ্যেও মিল খুঁজে পাই, কাছাকাছি উচ্চারণ ও অর্থের শব্দ খুঁজে পাই। এই সব কিছুই আমাদের একটি সাধারণ ভাষার দিকে ইঙ্গিত করে। সাধারণ এক প্রজাতির ভাষার শুরুটাও যে একটা সাধারণ ভাষা দিয়েই হবে, তা আর আশ্চর্য কী!

পাঁচ

ভাষার উদ্ভবের সময়কাল নাহয় পাওয়া গেল। কিন্তু কথা হলো, এই ভাষাটা এলো কীভাবে? ভাষার উৎপত্তি যে যোগাযোগের জন্য, সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু এই তাড়নাটা মানুষ অনুভব করা শুরু করল কেন? এই প্রশ্নটাই মানুষের ভাষা খুঁজে পাওয়া নিয়ে দ্বিতীয় প্রশ্ন। (প্রথম প্রশ্নটা কী ছিল, সেটা কি আলাদা করে আর বলা লাগবে? তা-ও বলে দেই। প্রশ্নটা হলো, ভাষার উৎপত্তিটা কখন হয়েছিল? আসলে, এই প্রশ্নের উত্তর বের করতে না পারলে, সে সময় মানুষ কী কারণে এই তাড়নাটা অনুভব করেছিল, সেটা বের করা কঠিন।)

ভিত্তি করে বলেছেন, শুধু পুরুষরাই এমনটা না-ও করতে পারে। নারীরাও হয়তো একইভাবে পুরুষদের আকৃষ্ট করতে চাইত।

কিন্তু এরকম হলে, এর ফলে জন্ম নেওয়া বাচ্চাদের বাকিদের তুলনায় অনেকটা এগিয়ে থাকার কথা। বাড়তি কোনো বৈশিষ্ট্য বা সুবিধা পাওয়ার কথা তাদের। আবার, একই জিনিস বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়া সবগুলো গোত্র বা দলের মধ্যেই ঘটতে হবে। এসব কিছু বিবেচনা করে ডারউইনের এই উত্তরকে ঠিক জুতসই মনে হয় না।

কিন্তু এই আইডিয়ার ওপরে ভিত্তি করেই দ্বিতীয় উত্তর বা ধারণাটি গড়ে ওঠে। বিজ্ঞানীরা খেয়াল করে দেখলেন, মানুষ, এমনকি অন্ধরাও সাধারণত হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলার চেষ্টা করে। তাহলে, 'আদিভাষা'টা হয়তো স্বর নির্ভর না, বরং ভঙ্গিনির্ভর হয়ে গড়ে উঠেছিল। সেই ব্যাপারটাই এখনও আমাদের মধ্যে রয়ে গেছে। হয়তো সেজন্যই এখনো আমরা কিছু বোঝাতে না পারলে হাত বা কাঁধ নেড়ে অঙ্গভঙ্গি করি। আবার, সঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই ভঙ্গি ভালোরকম প্রভাব রাখতে পারে। যেমন- বক্তব্যের সময় মানুষের ভঙ্গি দেখে আকৃষ্ট হই আমরা। নাচের মুদ্রা দেখে আকৃষ্ট হই। এই ব্যাপারগুলোর ব্যাখ্যাও পাওয়া যায় কিছুটা করে।

আবার খেয়াল করলে দেখা যাবে, অন্যান্য বেশ কিছু প্রাণীও টুকটাক

shukhobor-february-2020.indd 20 2020-02-19 2:42 AM

কাউকে গান গাইতে শুনলে আমরাও গলা মেলাই

অঙ্গভঙ্গি করে। মানুষ হয়তো ভাবতে শেখার কারণে এই ভঙ্গিকে এগিয়ে নিয়ে এসেছিল আরো অনেক দূর। আর, অঙ্গভঙ্গি করে যে পুরোপুরি যোগাযোগ করা যায়, সেটা তো আমরা জানিই। মূক-বধির অনেকেই এভাবে যোগাযোগ করেন।

দারুণ চিন্তা-ভাবনা হলেও, এই প্রস্তাবনারও একটা বড় ঝামেলা আছে। ভঙ্গিনির্ভর এই ভাষা থেকে স্বরনির্ভর ভাষা এলো কীভাবে?

ফলে, তৃতীয় আরেকটি আইডিয়া বা উত্তর নিয়ে ভাবলেন বিজ্ঞানীরা। এই আইডিয়াটিই বর্তমানে সবচেয়ে ভালোভাবে ভাষাকে ব্যাখ্যা করতে পারে। এটাকে বলে ওনোম্যাটোপিয়া (onomatopoeia)। মানে, কোনো শব্দ শুনে সেটাকে নকল করার চেষ্টা। এখনও মানব শিশুদের এরকম শব্দ শুনে শুনে বলার চেষ্টা করতে দেখা যায়।

মানুষের যদি ভাষা বলার মতো যথেষ্ট বোধ না-ও থেকে থাকে, তবু শুনে শুনে এই নকল করতে পারাটা খুব জটিল কিছু না। আগেই বলেছি, ভাষা আসতে আসতে ততদিনে মানুষের মধ্যে ধ্বনি উচ্চারণের শারীরিক সক্ষমতা চলে এসেছে। তাছাড়া, নতুন কিছু গবেষণা থেকে বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন, অন্যান্য প্রাইমেটও বেশ ভালোভাবেই শ্বাস এবং গলার নড়াচড়া নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

যৌক্তিকভাবে ব্যাপারটা থেকে আমরা একটা কল্পনা দাঁড় করাতে পারি। বিভিন্ন প্রাণীর ডাক শুনে শুনে মানুষ সেটাকে নকল করতে শিখেছে। সেসব প্রাণীর বিরুদ্ধে টিকে থাকতে গিয়ে বানাতে হয়েছে সরঞ্জাম। সেই সাথে, সেরকম কোনো প্রাণী, যেমন- বাঘকে আসতে দেখলে বাকিদের সাবধান করে দেওয়ার প্রয়োজনীতা তৈরি হয়েছে। বাঘের গর্জন নকল করে নিজেদের লোকজনকে সতর্ক করে দেওয়ার চেয়ে সহজ আর কী আছে? তাতে করে ভিন্ন ভিন্ন প্রানিকে শনাক্ত করতে পারছে মানুষ। আবার, ধীরে ধীরে এসব ধ্বনি বা ডাকের মধ্যে পরিবর্তন করার চেষ্টা করছে। আরেকটা ভালো ব্যাপার হলো, বিভিন্ন প্রাণির ডাক নকল করে শিকারের জন্য তাদেরকে প্রলুব্ধ করে ফাঁদেও ফেলা সম্ভব ছিল। এভাবে ধীরে ধীরে অর্থবোধক ধ্বনি বুঝতে শিখেছে মানুষ। বুঝতে শিখেছে, ধ্বনির মাধ্যমে চাইলে অন্যদেরকে কিছু বোঝানো যায়।

সেই সাথে অঙ্গভঙ্গিও শিখছিল মানুষ। এটা অবশ্য অনেকটাই সহজাত (মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীর মধ্যেও এটা দেখা যায়)। তাছাড়া, সরঞ্জাম বানাতে গিয়েও হাত-পা অর্থবোধকভাবে নাড়ানোর কৌশল বুঝতে পারছিল মানুষ। এভাবেই, সময়ের সাথে সাথে গড়ে উঠতে শুরু করেছিল ভাষা।

একটা সময়, হয়তো রাতের বেলা আগুনের পাশে বসে মজা করে প্রাণীদের ডাক নকল করতে গিয়ে, বা নিজেদের মতো করে কিছু বোঝাতে গিয়ে মানুষ গাইতে শিখেছে। টের পেয়েছে, গলার তাল-লয় নিয়ন্ত্রণ করে অর্থবোধক ধ্বনিকে আরো সুমধুর করে তোলা যায়।

এই গান গাওয়াটার খুব বড় একটা ভূমিকা আছে বলে মনে করেন বিজ্ঞানীরা। সাধারণ বাক্যে 'আমরা' বা দলগত বোধটা সেভাবে প্রকাশ পায় না। গানে সেটা সহজেই করা যায়। একজন গাইতে থাকলে বাকিরা গলা মেলাতে পারে। এটাও আসলে আমাদের সহজাত প্রবৃত্তির অংশ। এখনও সেজন্যই গান শুনলে আমরাও গলা মেলাই, মেলাতে চাই। শব্দ করে না হলেও মনে মনে গেয়ে উঠি একই বাক্য।

ইউনিভার্সিটি কলেজ, লন্ডনের নৃতত্ত্ববিদ জেরোম লুইস মনে করেন, এভাবেই গড়ে উঠেছে ভাষা। আর, এই প্রস্তাবনা সত্যি হলে এটি যেমন ভাষা ও গানের উৎপত্তির ব্যাখ্যা দিতে পারবে, তেমনি বলতে পারবে এদের উৎপত্তির সময়কালও। আর, এই উৎপত্তির সময়টা পেলে দিনে দিনে ভাষার ওপরে কী প্রভাব পড়েছে এবং ভাষা কীভাবে বদলেছে- তার একটা মোটামুটি হিসেব আমরা দাঁড় করাতে পারব।

শব্দ হয়তো ফসিল রেখে যায় না, রেখে যায় না কোনো চিহ্ন। কিন্তু এত বছর পরে হলেও, আমরা এর ইতিহাস লেখার সূত্র খুঁজে পেয়েছি। হয়তো আরো কিছুটা সময় লাগবে, কিন্তু আমরা নিশ্চয়ই লিখে ফেলতে পারব ভাষার ইতিহাস। মানুষের ইতিহাসের ওপরে এর প্রভাব ও সময়ের বাঁকে বাঁকে এর দিক বদল। আসলে, বিজ্ঞানীরাও সেজন্যই ভাষার গল্পটা বোঝার চেষ্টা করে গেছেন নিরন্তর।

কারণ, ভাষার ইতিহাস ছাড়া মানুষের ইতিহাস কোনোভাবেই পূর্ণতা পায় না।

shukhobor-february-2020.indd 21 2020-02-19 2:42 AM

প্রতি মাসের জীবন যাপন খবর

ভিন দেশি ভাষা শিক্ষার উত্তম বয়স

প্রচলিত আছে, 'একটি বিদেশি ভাষা শেখা আর সেই ভাষাভাষী জাতিকে জয় করা সমান।' শুনতে অদ্ভুত লাগলেও এটা অনেকটা সত্যও বটে। কেননা, যখন কেউ বিদেশি ভাষায় দক্ষ হয়ে ওঠেন, তখন তিনি খুব সহজেই সেই জাতির সাথে মেলামেশা করতে পারেন। তাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে পারেন। বর্তমান বিশ্বে যার যোগাযোগ দক্ষতা যত বেশি, তার গ্রহণযোগ্যতা বা ক্যারিয়ার গঠনের ক্ষেত্রে সফলতা পাওয়ার সম্ভাবনাও তত বেশি। যেমন- কেউ উচ্চশিক্ষার জন্য জার্মানিতে বা জাপানে যেতে চাচ্ছেন। এখন তার যদি জার্মান বা জাপানি ভাষা জানা থাকে, তাহলে তিনি ভিসা পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন।

উন্নত দেশগুলো নিজেদের ভাষাকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শুধুমাত্র তাদের ভাষা জানা ব্যক্তিদের বিভিন্ন বৃত্তির মাধ্যমে পড়াশোনা ও চাকরির সুবিধা দিয়ে থাকে। সেই কারণেই আমাদের দেশের রাজধানী ঢাকা থেকে শুরু করে মফস্বলেও কোরিয়ান কিংবা চীনা ভাষা শেখানোর অসংখ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

একাধিক ভাষায় দক্ষতা থাকা এখন অতীব গুরুত্বপূর্ণ

একসময় বিশ্বের প্রায় সকল প্রান্তেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল। ব্রিটিশরা তাদের সাম্রাজ্য পরিচালনার সুবিধার্থে স্থানীয় মানুষদের ইংরেজি ভাষা শেখাতো। সেখান থেকেই বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে ইংরেজি ভাষা। যার ফলে সারাবিশ্বে যোগাযোগের ভাষা হিসেবে এখনো ইংরেজি সবার আগে। বর্তমানে কোনো জাতির ব্রিটিশদের মতো প্রশাসনিক সাম্রাজ্য নেই। তবে বেশ কয়েকটি দেশ তাদের পণ্য বা সেবার মাধ্যমে নিজস্ব বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য তৈরি করেছে। এক্ষেত্রে সবার উপরে আছে চীন।

বিশ্বের এমন কোনো দেশ নেই যেখানে চীনের পণ্য বিক্রি হয় না। চীন তাদের এই ব্যবসা বাণিজ্যকে আরো সুদূরপ্রসারী করে তোলার জন্য বিভিন্ন দেশে তাদের ভাষাকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এমনকি অনেক দেশে ঋণ প্রদানের সময় চীন তাদের ভাষা শেখানোর শর্ত জুড়ে দিচ্ছে। এছাড়া দুটি দেশের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটানোর জন্য সংস্কৃতির আদানপ্রদান খুবই জরুরি। আর এক্ষেত্রে ভাষা হলো সবচেয়ে বড় মাধ্যম। সে কারণে প্রতিটি দেশই তাদের পররাষ্ট্র নীতিতে নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতিকে ছড়িয়ে দেওয়ার বিষয়ে প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

বিদেশি ভাষা কেন শিখবেন?

বর্তমান বিশ্বকে বলা হচ্ছে গ্লোবাল ভিলেজ। এই বিশাল গ্লোবাল ভিলেজে রয়েছে অসংখ্য দেশের কোটি কোটি মানুষের আনাগোনা। তাদের সাথে মিশতে হলে কিংবা একসাথে কাজ করতে হলে আপনাকে অবশ্যই তাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। আর এক্ষেত্রে প্রয়োজন একটি সাধারণ ভাষা। এজন্য ইংরেজিকে সবাই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।

কিন্তু ইউরোপের অনেক দেশ রয়েছে যেখানে ইংরেজির গুরুত্ব কম বা তারা ইংরেজি জানেন না। সেক্ষেত্রে তাদের সাথে ইংরেজির মাধ্যমে যোগাযোগ করা সম্ভব নয়। আপনি যদি জার্মান ভাষা জানেন তাহলে খুব সহজেই জার্মানদের সাথে ভাবের আদান প্রদান করতে পারবেন। এই বিষয়টি সকলেই জানেন। এছাড়াও রয়েছে আরো কিছু সুবিধা।

বর্তমানে বিদেশি ভাষা জানার বড় সুবিধা হলো কর্মক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব লাভ এবং সফল ক্যারিয়ার গঠনের সুযোগ। কোনো ব্যক্তি এক বা একাধিক ভাষায় দক্ষ হলে তাকে যেকোনো প্রতিষ্ঠান লুফে নেবে। ভিনদেশি ভাষা শেখার অন্যতম বড় সুবিধা হলো এর মাধ্যমে আত্মবিশ্বাস তৈরি হওয়ার সাথে সাথে সৃজনশীলতাও বৃদ্ধি পায়। এর সাথে সঠিক সিদ্ধান্ত এবং বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণের জন্য মানসিক দক্ষতার বিকাশ ঘটে। এছাড়া কেউ যদি একটি বিদেশি ভাষা শিখতে পারেন, তাহলে তার জন্য অন্যান্য ভাষা শেখাও সহজ হয়ে যায়।

বিদেশী ভাষা শেখার উপযুক্ত বয়স কোনটি?

অনেক বাবা-মা স্বপ্ন দেখেন তাদের সন্তান একাধিক ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারবে। আবার অনেকে স্বপ্ন দেখেন তাদের ছেলে বা মেয়ে বড় বড় ব্যবসায়িক মিটিংয়ে বিদেশিদের সাথে তাদের ভাষায় আলাপ আলোচনা করবে। এমন স্বপ্ন প্রায় প্রত্যেক শিক্ষিত বাবা-মা দেখেন।

shukhobor-february-2020.indd 22 2020-02-19 2:42 AM

বর্তমানে প্রায় সবাই বিদেশি ভাষা শেখার গুরুত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। কিন্তু এক্ষেত্রে বড় প্রশ্ন হলো কোন বয়স থেকে সন্তানকে বিদেশি ভাষা শেখানো উচিত? কিংবা কোন বয়সে বিদেশি ভাষা শেখা সবচেয়ে সহজ?

বাচ্চাদের বয়স যখন ৩-৪ বছর, তখন তারা খুব সহজে একাধিক ভাষা শিখতে পারে। এর পেছনে বড় কারণ তখন বাচ্চারা নতুন কিছু শেখার জন্য বেশ আগ্রহী হয়ে থাকে। যেটা বড় হওয়ার সাথে সাথে কমতে থাকে। অধিকাংশ গবেষকের মতে, বাচ্চাদের দ্বিতীয় কোনো ভাষা শেখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বয়স ৬-৭ বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্ববর্তী সময়। তবে কোনো কোনো গবেষকের মতে, এটি বয়ঃসন্ধির পূর্ব পর্যন্ত হতে পারে।

কিন্তু অনেকের কাছে বিষয়টি গ্রহণযোগ্য না-ও হতে পারে। সত্যিকার অর্থে একটি শিশুর আচার-আচরণ, চিন্তাভাবনা করার দক্ষতা, শেখার ক্ষমতা ও সৃজনশীলতার ভিত্তি রচিত হয় ৬-৭ বছর বয়সের মধ্যে। শিশুরা যেহেতু অনুকরণপ্রিয়, সে কারণে তারা আশেপাশের বিভিন্ন বিষয় থেকে শিখে থাকে। তবে ভাষা শেখার হারটা সবচেয়ে বেশি ৩-৪ বছর বয়সে। এই সময়ে তারা খুব সহজে নতুন নতুন শব্দ শিখতে পারে। সেই কারণে এই সময়টা বাচ্চাদের ভাষা শেখার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

মাতৃভাষায় দক্ষ হওয়ার আগে বাচ্চাদের বিদেশি ভাষা শেখানো উচিত নয়;

শিশুরা ৬-৭ বছরের মধ্যেই একাধিক ভাষা শিখতে সক্ষম। কারণ তারা এই বয়সটা পার করে বিভিন্ন বিষয় শেখার মধ্য দিয়ে। তাদের পূর্ণ মনোযোগ থাকে আশেপাশের পরিবেশ থেকে বিভিন্ন কিছু শেখার প্রতি। সেক্ষেত্রে কেউ যদি তাদের একসাথে একাধিক ভাষা শেখায়, তাহলেও তাদের কোনো সমস্যা হয় না।

তবে শিশুদের দ্বিতীয় কোনো ভাষা শেখার ক্ষেত্রে তার আশেপাশের পরিবেশ কিংবা পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, কোনো বাচ্চার মা ব্রিটিশ এবং বাবা ইতালিয়ান। তারা থাকেন যুক্তরাজ্যে। সেক্ষেত্রে বাচ্চাটি জন্য একইসাথে ইংরেজি ও ইতালিয়ান শিখতে পারবে। আবার ধরুন, কোনো বাচ্চার বাবা-মা দুজনেই জার্মান এবং ৬-৭ বছর বয়সে কোনো কারণে পরিবারের সাথে যুক্তরাজ্যে চলে এসেছে। এখন যুক্তরাজ্যে থাকার জন্য তাকে বাধ্য হয়ে দ্রুত ইংরেজি শিখতে হবে। এক্ষেত্রে সেই বাচ্চার ইংরেজি শিখতে অনেক দেরি হবে। কারণ তাকে জোর করে শিখতে হচ্ছে।

শিশুরা ৬-৭ বছরের মধ্যে যেকোনো বিষয় ভালোভাবে শিখতে পারে সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে বাচ্চাদের দ্বিতীয় বা তৃতীয় কোনো ভাষা শেখানোর ক্ষেত্রে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে সে তার মাতৃভাষায় কতটুকু দক্ষ হয়েছে। একটি শিশু মাতৃভাষায় দক্ষ হওয়ার পূর্বেই যদি তাকে দ্বিতীয় কোনো ভাষা শেখানো হয়, তাহলে তার মাতৃভাষায় বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে।

এ কারণে শিশুদের বিদেশি ভাষা শেখানোর জন্য উপযুক্ত বয়স হলো ১২-১৩ বছর। কেননা এই বয়সের মধ্যে তারা মাতৃভাষায় বেশ দক্ষ হয়ে ওঠে। এরপর তারা দ্বিতীয় কোনো ভাষাকেও ভালোভাবে রপ্ত করতে পারে। গবেষণাও ঠিক তেমনই বলছে। যুক্তরাজ্যে ১৭,০০০ শিশুর উপর চালানো এক গবেষণায় দেখা যায়, যেসব শিশু ১১ বছর বয়সে ফরাসি ভাষা শেখা শুরু করেছে, তারা অন্যদের চেয়ে ভালো ফলাফল করেছে।

শিশুদের বিদেশি ভাষা শেখানোর সহজ উপায়

শিশুদের সহজে বিদেশি ভাষা শেখানোর জন্য কিছু পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে। এর জন্য প্রথমে যে ভাষাটি শেখাবেন, সেই ভাষার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। এক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে মা-বাবা হিসেবে আপনি সেই ভাষাটি না-ও জানতে পারেন। তখন শুধু সেই ভাষাটির মূল বিষয়গুলো নিজে শিখে বাচ্চাদের শেখাতে পারেন। এছাড়া যেসব মাধ্যম থেকে আপনার বাছাই করা বিদেশি ভাষা শেখা সম্ভব, তার সবগুলোই ব্যবহার করবেন। যেমন- ভাষা শেখার বই, অ্যাপস, অনলাইন ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রাম ও বিভিন্ন গেমস। চাইলে সন্তানকে কার্টুন বা মুভি দেখানোর মাধ্যমেও বিদেশি ভাষা শেখাতে পারেন। আপনার চারপাশে অনেক শিশুকে দেখবেন যারা অনর্গল হিন্দি বলছে এবং বুঝতে পারছে। তাদের পক্ষে এটা সম্ভব হয়েছে বিভিন্ন হিন্দি কার্টুন দেখার মাধ্যমে। এছাড়া ভাষা শেখার বিভিন্ন সরঞ্জাম কিনেও সন্তানকে বিদেশি ভাষা রপ্ত করানো সম্ভব। তবে শুধুমাত্র শিখলেই হবে না, এর সাথে প্রয়োজন সঠিক অনুশীলন বা পরীক্ষা। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ইনস্টিটিউট বা সেই ভাষাভাষী মানুষের সহায়তা নিতে পারেন।

(*সংকলিত*)

shukhobor-february-2020.indd 23 2020-02-19 2:42 AM

প্রতি মাসের সুখবর তারুণ্য

অভ্রম্যান মেহেদী হাসান

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসের কোনো এক স্থানে ক্যাম্পাসেরই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া (জুনিয়র-সিনিয়র) ছাত্রের মাঝে কথা হচ্ছিল।

বড় ভাই: কত করে নিবি?

ছোট ভাই: মানে? কীসের কত করে নিবো?

বড় ভাই: আরে, তোর সফটওয়্যারের দাম কত করে রাখবি?

ছোট ভাই: দাম রাখবো কেন? ওটা তো ফ্রি। কোনো টাকা পয়সা দিতে হবে না।

জুনিয়রের কথা শুনে সিনিয়র এবার যারপরনাই অবাক। বলিস কী? বলা ছাড়া আর কোনো কিছুই বের হয়নি তার গলা দিয়ে। ওদিকে জুনিয়রের বরাবরের মতোই স্বাভাবিক উত্তর, "হ্যাঁ। ভাষার জন্য টাকা নেবো কেন?"

সিনিয়রের মুখ থেকে এবার আর কোনো কথা বের হয় না। আক্কেলগুড়ুম হয়ে যায় তার। তিনি মনে মনে ভাবতে থাকেন, কী বলছে এই ছেলে? আর এদিকে আমি মনে মনে আঁকতে থাকি কয়েকজন মানুষের মুখ। মানুষগুলোর সাথে এই জুনিয়র ছেলেটির বেশ মিল খুঁজে পাই। মিল খুঁজে পাই সালাম, রফিক, বরকত আর জব্বারদের সাথে। ভাষাটাকে তারা ঠিক এই ছেলেটির মতো করেই ভালবেসেছিলেন। ভাষার জন্য তাদের ঠিক এতটাই মমত্ববোধ ছিল বুকের বাঁ পাশে। মনে মনে ভাবি, বহুদিন পর বাংলা আরেকজন ভালবাসার মানুষ খুঁজে পেল। স্বার্থের এই জগতে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসার মানুষ খুঁজে পাওয়া খুব দুষ্কর।

মেডিকেল চত্বরে কথোপকথনরত সেদিনের ঐ জুনিয়র ছেলেটির নাম মেহদী হাসান খান। তিনি বাংলা লেখার একটি সফটওয়্যার তৈরি করেছিলেন। সফটওয়্যারটি দিয়ে ইংরেজী অক্ষরে 'ami vat khai' টাইপ করলে খুব সহজেই বাংলায় 'আমি ভাত খাই' লেখা হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় ভাইয়ের সাথে মেহদী হাসানের সেই সফটওয়্যার নিয়েই কথা হচ্ছিল।

ঘটনাটি আজ থেকে কয়েক বছর আগের। সেসময় কম্পিউটারে বাংলা লেখা মানে এক ভীষণ যন্ত্রণাসম। এজন্য আবার ইংরেজী টাইপ শেখার মতো বাংলা টাইপ শেখো, তারপর অনুশীলন করো, আস্তে আস্তে আয়ত্বে আনো, তারপর চেষ্টা করে দেখ। আর মেহেদী হাসানের এই সফটওয়্যারটি যেন এই দীর্ঘমেয়াদী ও যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপারটির এক নিমিষেই ইতি ঘটিয়ে দিলো। এতটা যেন কেউ আশা করেনি! এ যেন মেঘ না চাইতেই জলের স্পর্শ!

বাংলা লেখার এই সফটওয়্যারটিই আজকের বাংলা টাইপিস্টদের নিকট অতি পরিচিত নাম অভ্র, যার জন্য আলাদা কিবোর্ড লাগে না, আলাদা করে টাইপিংও শিখতে হয় না। ব্যবহারকারীরা শুধু ইংরেজি অক্ষরে মনের কথাটি লিখছেন আর তা অভ্রের যাদুতে বাংলায় হাসছে। তবে যে অভ্রর সাহায্যে আপনি আজ এত সহজে, এক নিমিষে বাংলা লিখতে পারছেন, সেই অভ্রর জনক মেহদী হাসান কিন্তু তত সহজে কিংবা এক নিমিষে অভ্রকে তৈরি করতে পারেননি। এই সৃষ্টি সাধারণ কোনো সৃষ্টি নয়, তার এই সৃষ্টি ১০টি বছর ধরে রচিত একটি গল্পের নাম।

মেহেদী হাসান

গল্পের শুরুটা ছিল ঠিক এরকম। তখন ২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে চলছিল বাঙালির প্রাণের উৎসব বইমেলা। একাডেমি চত্বর জেগে উঠেছিল বাঙালিয়ানার হরেক রকম সাজে সজ্জিত অসংখ্য বইয়ের স্টলে। একাডেমির বাতাসে তখন নতুন বইয়ের ঘ্রাণ। সেবারের সেই বইমেলায় একটি সংগঠন অংশ নিয়েছিল, নাম বাংলা ইনভেনশ ফ্রু ওপেন সোর্স, সংক্ষেপে বায়োস। তবে বায়োস বই বিক্রেতা সংস্থা নয়। তারা বইমেলায় এসেছিল একটি প্রদর্শনী করতে। এই সংগঠনের সদস্যরা মেলায় সম্পূর্ণ বাংলায় লোকালাইজ করা একটি লিনাক্স ডিস্ট্রোর প্রদর্শনী করেছিল। এর নাম ছিল বাংলা লিনাক্স।

বাংলা লিনাক্সের বিশেষত্ব ছিল, এর সাহায্যে বাংলায় লেখার পাশাপাশি উইন্ডোর টাইটেল, মেনু, ফাইলের নামকরণ সবই বাংলায় করা

shukhobor-february-2020.indd 24 2020-02-19 2:42 AM

যায়। এমন সুন্দর ও উপযোগী একটি সিস্টেম সবারই নজর কেড়েছিল। কেননা বাংলা লেখার জন্য তখন যেসব কিবোর্ড প্রচলিত ছিল, সেসব দিয়ে খুব একটা স্বাচ্ছন্দ্যে বাংলা লেখা যেত না। আর তাদের অপারেটিং সিস্টেমটি সম্পূর্ণ বাংলায় ছিল না। এছাড়া এগুলো দিয়ে বাংলায় শুধু টাইপের কাজই চালানো যেত। তো বাংলা লেখার এমন একটা খটমট সময়ে এমন সহজ একটি সিস্টেম সবার নজর কাড়বে এটাই তো স্বাভাবিক। বায়োসও তাই সবার নজর কেড়েছিল।

সেবারের মেলায় বায়োসের ঐ প্রদর্শনীতে দর্শকদের ভিড়ে দাঁড়িয়ে ছিল একজন ক্ষুদে দর্শক। ছেলেটির প্রোগ্রামিংয়ে ছিল ভীষণ আগ্রহ। প্রদর্শনীর অন্যান্য দর্শকদের সাথে তার একটি পার্থক্য ছিল। ঘরে ফেরার সময় আর সবাই যখন মেলার উত্তেজনা নিয়ে ঘরে ফিরেছিল, তখন সে ঘরে ফিরেছিল প্রদর্শনীর বিষয়বস্তুটি স্নায়ুতে বয়ে নিয়ে। সেদিন থেকেই তার মাথায় কাজ করছিল- কীভাবে এমন একটা কিছু বানানো যায়, যা দিয়ে অতি সহজেই সবাই বাংলা লিখতে পারবে। বইমেলার সেই ছোট্ট ছেলেটিই ২০১৪ সালে অভ্র সফটওয়্যারের জনক ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের ছাত্র মেহদী হাসান।

বিজয় কিবোর্ড

মেলা থেকে সেদিন ঘরে ফিরেই মেহদী বায়োসের লিনাক্স নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করেন। কিন্তু তার কম্পিউটারে উইন্ডোজ থাকায় ইচ্ছা সত্ত্বেও বাংলা লিনাক্স দিয়ে কাজ করতে পারছিলেন না তিনি। কিন্তু প্রোগ্রামিংয়ে আসক্ত ছেলেটির মনে এই ব্যাপারটি গভীর এক কৌতূহলের সৃষ্টি করেছিল। আর তাই তিনি বাংলা লিনাক্সের ঐ ফন্টটি ইনস্টল করেন। আর এ সময়ই তার চোখে পড়লো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

অভ্র কিবোর্ড

মাইক্রোসফট ওয়ার্ড কিবোর্ডের ইনসার্ট ক্যারেক্টার ব্যবহার করে ঐ ফন্টের ক্যরেক্টারগুলো আনা যায় এবং বেশ চমৎকার কাজও করে। তবে সেসময় এটি খুবই যন্ত্রণাদায়ক একটি ব্যাপার ছিল। আরো কষ্টকর ছিল যুক্তাক্ষর লেখা। কিন্তু এরপরও মেহেদীকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি এই ফন্ট। কেননা, এভাবে লেখাটা ছিল বেশ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার, যা টাইপকারীর মাঝে বিরক্তির উদ্রেক করে। কিন্তু মেহদী তো বিরক্তি এনে দিতে এই প্রজেক্ট নিয়ে নামেননি। তিনি তো চান বাংলা লেখার এমন একটি সিস্টেম, যার সাহায্যে যে কেউ অনায়াসে বাংলায় লিখে ফেলতে পারবে তার মনের কথাগুলো।

তবে এ পর্যায়ে এসে মেহদী উপলব্ধি করলেন- তার স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য এখন প্রয়োজন একটি কিবোর্ডের, যা দিয়ে ইউনিকোড দিয়ে খুব সহজেই বাংলা লেখা যাবে। কিন্তু এখানেই সমস্যাটি বাঁধে। মেহদী ভেবেছিলেন, কিবোর্ডটি ইনস্টল করে নামিয়ে নেয়া যাবে। কিন্তু তা আর হয়ে উঠলো না। কেননা, সেটি কোথাও খুঁজে পেলেন না তিনি। তিনি বুঝতে পারলেন, এমন কিবোর্ড পেতে হলে তাকে কিবোর্ড তৈরি করতে হবে। কিন্তু কীভাবে সম্ভব সেটা?

এজন্য তো অনেক সময় ও পরিশ্রমের প্রয়োজন। এত সময় যে মেহদীর ছিল না। কেননা ততদিনে তিনি সেই ছোট ছেলেটি আর নেই। তিনি তখন ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে পড়ালেখা করছেন। কিন্তু সৃষ্টির নেশা পেয়ে বসেছিল তাকে। এ এক মারাত্মক নেশা। মেহদীর বেলায়ও যেন তা-ই হলো।

ক্লাসে, ক্যাম্পাসে সরব প্রাণোচ্ছল ছেলেটি কেমন যেন উদাস হয়ে গেলো। কারো সাথে আগের মতো মেশে না। নিজের শরীরের প্রতি খেয়াল নেই, ঠিক নেই নাওয়া-খাওয়ার। হোস্টেল রুমের দরজা জানালা বন্ধ করে সারাক্ষণ বসে বসে কী যেন করে! শিক্ষকরা ভাবলেন, উচ্ছন্নে গেল বুঝি ছেলেটা। বন্ধুরা ভাবলো, কী করছে ও? কিন্তু মেহদী জানতেন তিনি কী করছেন। একদিকে পড়াশোনা অন্যদিকে ইউনিকোডভিত্তিক কিবোর্ড বানানোর চেষ্টা। সব সন্দেহ পাশ কাটিয়ে তিনি চলছিলেন তার গতিতে। আর এভাবেই একদিন তিনি তৈরি করে ফেললেন একটি প্রোটোটাইপ।

এই অ্যাপ্লিকেশনটি মেহদী প্রথমে বানিয়েছিলেন মাইক্রোসফটের ডটনেট ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করে। কেননা অ্যাপ্লিকেশনটি তিনি

shukhobor-february-2020.indd 25 2020-02-19 2:42 AM

বানিয়েছিলেন উইন্ডোজের জন্য। কিন্তু ঝামেলাটা তখন হলো, যখন ভারতে আয়োজিত বাংলা ফন্ট তৈরির একটি প্রতিযোগীতায় মেহদী নিজের তৈরি প্রোটোটাইপটি পাঠালেন। কারণ, মেহদীকে তারা জানালো, তার তৈরি প্রোটোটাইপটি ঘন ঘন ক্র্যাশ হচ্ছে।

মেহদী আন্দাজ করতে পারলেন ঘটনাটা কী। তবে দমে গেলেন না। বরং এবার তিনি যেটা করলেন তা হলো, তিনি ডটনেট বাদ দিয়ে ক্ল্যাসিক ভিজুয়্যালের ওপর ভিত্তি করে আবার প্রোটোটাইপ তৈরি করলেন। এবার তিনি বুঝতে পারলেন, ক্র্যাশের ঝামেলাটা আর নেই। আর এভাবেই তৈরি হলো অভ্রর বর্তমান ফ্রেমওয়ার্ক। এবার যেন স্বার্থক হলো তার সেই বইমেলায় বায়োসের তৈরি ফন্ট দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে শুরু করা দীর্ঘযাত্রা।

মেহেদীর মস্তিষ্ক প্রসূত অভ্রর ওয়েবসাইটটির নাম ওমিক্রন ল্যাব। অভ্র ও ওমিক্রন ল্যাব মূলত একই বয়সী। কেননা, অভ্রর সাথেই তো ওমিক্রন ল্যাবের জন্ম। অভ্রর এই অফিসিয়াল সাইট ওমিক্রন ল্যাব কিন্তু আপনা আপনিই দাঁড়িয়ে যায়নি। একে দাঁড় করানোটা ছিল তার জন্য আরেকটি চ্যালেঞ্জ। সাইটটিকে সবার নিকট গ্রহণযোগ্য করে তুলতে এবং কেউ যেন না ভাবে সাইটটি কোনো প্রফেশনাল সাইট না- সেদিকে মেহদী ছিলেন সচেষ্ট। আর এজন্য কম কষ্ট করতে হয়নি তাকে।

নাওয়া-খাওয়া, পড়ালেখা ভুলে সারাক্ষণ তাকে লেগে থাকতে হয়েছে সাইটটির পেছনে। সাইটটির প্রতি মনোযোগ দিতে গিয়ে সবকিছুতে অমনোযোগী হয়ে পড়েছিলেন তিনি। এই এলেমেলো জীবনযাপন কারো চোখ এড়ালো না। সবাই ভাবলো, ছেলেটা বোধহয় উচ্ছন্নে গেল। শিক্ষকগণ তো একসময় তাকে বলেই বসলেন মেডিকেল ছেড়ে দিতে। কিন্তু মেহদীর তো তখন এসবে কান দেয়ার সময় নেই। তিনি তখন ব্যস্ত সাইটে নিয়মিত আপডেট দিতে, ম্যানুয়াল লিখতে, ভার্সন নম্বর বাড়াতে আর ইউজারদের প্রশ্নের উত্তর দিতে। আর এভাবেই আস্তে আস্তে অভ্র পৌঁছে যায় ইউজারদের নিকট। এর স্বীকৃতি স্বরূপ তাকে নিয়ে প্রতিবেদন করে কম্পিউটার টুমরো নামের একটি মাসিক ম্যাগাজিন। এই স্বীকৃতি মেহেদিকে এতটাই আনন্দ দেয় যে, তিনি বুঝতে পারেন তিনি এমন কিছু একটা করেছেন যা অবশ্যই প্রশংসার দাবীদার।

অভ্র নিয়ে যাত্রাটা মেহদী একা শুরু করলেও শেষ অবধি কিন্তু তাকে একা পথ চলতে হয়নি। চলার পথে তিনি সাথে পেয়েছিলেন দেশি-বিদেশি বেশ কিছু স্বপ্নবাজকে। আর তাদের নিয়েই তিনি তৈরি করেছিলেন অভ্র টিম। এদের মধ্যে রয়েছেন অভ্রর ম্যাক ভার্সন প্রস্তুতকারী রিফাত উন নবী, অভ্রর কালপুরুষ ও সিয়াম রুপালী ফন্টের জনক সিয়াম, অভ্রর বর্তমান ওয়েবসাইট ও লিনাক্স ভার্সন প্রস্তুতকারী সারিম, ভারতের নিপন এবং মেহদীর সহধর্মিনী সুমাইয়া নাজমুনসহ আরো অনেককে।

মেহদী সেদিন তার ক্যাম্পাসের বড় ভাইকে বলেছিলেন, "ভাষার জন্য টাকা নেবো কেন?" তিনি শেষ পর্যন্ত সত্যিই কোনো অর্থ নেননি। তিনি সত্যিই ভাষাকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন সবার জন্য। ২০০৭ সালে অভ্র কিবোর্ড পোর্টালটি তিনি বিনামূল্যে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত করে দেন। এর মাধ্যমেই বাংলা ভাষা উন্মুক্ত হয়ে পড়ে তথ্য প্রযুক্তিতে।

অভ্র আজ ব্যবহৃত হচ্ছে সরকারি অফিস আদালতগুলোতে। এমনকি নির্বাচন কমিশনও তাদের প্রয়োজনীয় কাজ সারতে ব্যবহার করছে অভ্র, যা রাষ্ট্রকে কোটি কোটি টাকা খরচ থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। কিন্তু প্রচারবিমুখ মেহদীর পরিবর্তে কোনো চাওয়া নেই। কেননা তিনি এটাই তো চেয়েছিলেন। আর তাই তো তার স্লোগানই ছিল- 'ভাষা হোক উন্মুক্ত'। অভ্রর আভিধানিক অর্থ আকাশ। আর মেহেদীর তৈরি এই আকাশে বাংলা ভাষা যেন আজ সত্যিই উন্মুক্ত।

অভ্র-এর ব্যানার

বেসিস সম্মাননা গ্রহণ করছে অভ্র টিম

বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য মেহদী হাসান খানের যুগান্তকারী সফটওয়্যার অভ্র বাংলা ভাষাকে দিয়েছে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মেও হেসে-খেলে বেড়ানোর সুযোগ। শুধু তা-ই নয়, এই অভ্র রাষ্ট্রকেও করেছে লাভবান। অথচ আশ্চর্য হলেও সত্য, এর বিনিময়ে রাষ্ট্র তাকে আজ অবধি কোনো স্বীকৃতি দেয়নি। তবে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি না পেলেও মেহদীর ঝুলিতে জমা হয়েছে বেশ কিছু সম্মাননা। অভ্র কিবোর্ডকে মাইক্রোসফটের অনলাইন সংগ্রহশালায় ইন্ডিক ভাষাসমূহের সমাধানের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

অভ্রকে বাংলা কিবোর্ড রিসোর্স হিসেবে ইউনিকোড সংস্থার ওয়েবসাইটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া বাংলা তথ্য প্রযুক্তিতে বিশেষ অবদানের জন্য অভ্র টিমকে বেসিস বাংলা থেকে দেওয়া হয় স্পেশাল কন্ট্রিবিউশন অ্যাওয়ার্ড। পরবর্তীতে ২০১৬ সালে মেহদী হাসান টপ টেন আউটস্ট্যান্ডিং ইয়ং পার্সনস পুরস্কারে ভূষিত হন।

ব্যক্তি জীবনে এক সন্তানের জনক এই নিভৃতচারী সফটওয়্যার ডেভেলপার। স্ত্রী-সন্তান নিয়ে আছেন নিজের মতো। চিকিৎসাশাস্ত্রে ভাল ফল নিয়ে উত্তীর্ণ হলেও সেটা পেশা হিসেবে নেননি তিনি। প্রোগ্রামিংয়ের নেশাটা তার এখনও রয়ে গেছে আগের মতোই। আর তাই পেশা হিসেবে নিয়েছেন সেটাকেই।

(*সংগৃহীত*)

shukhobor-february-2020.indd 26 2020-02-19 2:42 AM

History of Mother Language Day

|| Mousifur Rahman ||

"What will be the official state language?" a question came out after the creation of Pakistan. As we know on that time Pakistan was formed by two different geographical areas from which East Pakistan became a new dominion of Pakistan. But two part of Pakistan had no similarities in respect of culture, tradition, language, and other aspects. Furthermore, distance between two parts was 1000 miles. So, it is quite vivid that religion was the only region why East Bengal became a part of Pakistan.

How the debate began

Leaders of Muslim League and Scholars were at that time preferred Urdu to be the official state language of Pakistan. Many political and religious leaders such as Sir Khwaja Salimullah, Sir Syed Ahmed Khan, Nawab Viqar-ul-Mulk, and Maulvi Abdul Haq had promoted Urdu as the lingua franca of Indian Muslims.

Subsequently, in 1947, Urdu was promoted as the state language of Pakistan through a national education summit in Karachi. Then Pakistan Public Service Commission took several initiatives to remove Bangla from study materials, currencies (notes and stamps) to extinguish the use of Bangla exponentially. The central education minister Fazlur Rahman devised wide-ranging plans to establish Urdu as the only state language. That linguistic partiality evoked a bitter sense of feeling to the people who had a sensitive attraction to Bangla. Among them Abdul Kashem, the secretary of Tamauddin Majlish led a rally with a group of students from Dhaka to protest that decision and establish Bangla as the state language of East Pakistan.

Protest under some organizations

Several organizations started protesting including Tamuddin Majlish, a Bengali Islamic Cultural Organization. It was the very first organization which was formed for language movement. It published "The State Language of Pakistan is Bengali or Urdu" on 15th September 1947 with a motive to administer rational logics to make Bangla as a state language of East Pakistan. In October 1947, National Language Action Committee formed by Professor Nurul Haque Bhuiyan of University of Dhaka. One of its proposal was establishing Bangla as a medium of education. Prof. D. Mohammad Salim, Sultana Nagar, Prodyot Kumar showed that, besides these organizations, other organizations like Democratic Youth League, East Bengal Scholar Society, and Journalist Forum administered different actions to establish Bangla as the national language. Regardless of these extensive protests, Urdu was recommended to the Constituent Assembly as the Lingua Franca in the Education Summit took place in Karachi in December 1948.

Language Debate in the Constituent Assembly of Pakistan

In 23rd February 1948, all the activities started through English and Urdu in the first Constituent Assembly of Pakistan and immediately Mr. Dhirendranath Datta, a Member of Assembly and East Bengal Congress opposed that decision. He gave a proposition to make Bangla as an official language. Consequently, Muslim League members challenged that proposal. That situation brought extensive protest from the students of different institutions Dhaka against it on

shukhobor-february-2020.indd 27 2020-02-19 2:42 AM

26 and 29 February 1948. After that strike, National Language Action Committee was formed again by the student wing on 2nd March. Mr. Shamsul Haque was selected as scholar convener of that committee.

Mohammad Ali Jinnah's Speech

Mohammad Ali Jinnah arrived Dhaka on 19th March 1948. He was the Governor General of Pakistan. On 21st March he gave a public speech at Race Course Ground at Ramana and declared "Urdu, and only Urdu shall be national language of Pakistan" then at Curzon Hall at the Convocation of University of Dhaka on 24th March, disobeying the demand from Bengalis. The students who was present there denied that declaration and language movement spread out exponentially all over the East Bengal. When Prime Minister Liaquat Ali Khan came to visit, he declared again that Urdu was the state language. The declaration was protested by students as well.

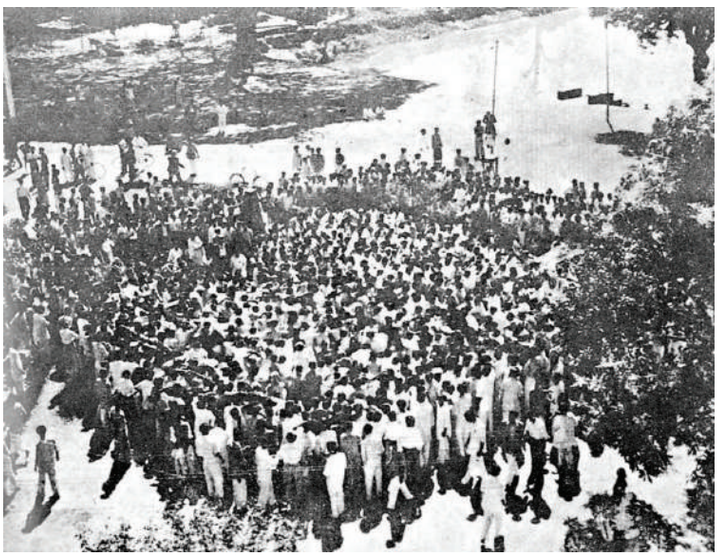

A massive number of student gathered at the University of Dhaka.

Declaration of Urdu as state language in Paltan Maidan, Dhaka

The situation was getting worse at this time. After the death of both Jinnah and Liaquat Ali Khan, Khawaja Nazimuddim was appointed as new Prime Minister. He was not prepared enough to handle the situation. On January of 1952, Prime Minister Nazimuddin reignited the controversy by repeating the viewpoint "Urdu will be the state language of Pakistan". After that, he went to Karachi to address the issue of provincial language. He also added the initiative of changing written Bangla into Arabic script. Massive protest came out against that decision from University of Dhaka. In a meeting of the National Language Action Committee, the proposal of the Bengali language in Arabic script was obviously strongly opposed and "Shorbodolio Kendrio Rashtrabhasha Koarmiporishod" formed consisting 40 members. Under the lead of Maulana Bhasani, on January 30, 1952 that organization held a rally at the Bar Library Hall of Dhaka University.

The Final Stage of the Language Movement

Finally, Prime Minister Khaja Nazimuddin announced that Urdu shall be the state language of Pakistan on 27th January at Paltan Ground. Consequently, the language movement spread out exponentially culminating with the students strike on the 30th of January. Furthermore, All Party Central Language Action Committee was held by Awami Muslim League Chairman Abdul Hamid Khan Bhashani. After that meeting, hartal, strike, procession was called in the whole country. The People of Bangladesh went through an extreme situation. Chief Minister of Pakistan executed Section-144 to resist them. Although he banned all sorts of gatherings and protests, nevertheless Bengali people kept continuing their protest. Shorbodolio Rashtrobhasha Shongrm Porishad conducted a meeting on the 20th of February at the central office of Awami Muslim League to prolong their activities. A controversy came out, whether they should oppose section 144 or not but some leaders like Abdul Matin, Oli Ahad, Golam Mahbub were prepared to resist Section-144. Therefore, they decided to break the curfew. The next day the 21st of February at 11AM a massive number of student gathered at the University of Dhaka. The students then commenced their rally proclaiming "we demand Bangla as a state language" or "Rashtro Bhasha Bangla Chai" Police then began battering people and lobbing tear gas. Students also started throwing stones at the police in response which led to a messy escalated situation. Frantic students gathered beside Dhaka Medical College and police opened fire at the students. Students such as Abdus Salam, Rafiq Uddin Ahmed, Sofiur Rahman, Abul Barkat and Abdul Jabbar among many unknown, were martyred that day. They left the world on that fateful day but etched their names in history. Their sacrifice ignited our Language Movement and our Independence Movement. These people protested and sacrifice their lives to preserve their mother language. It is thus on the 21st day of February at midnight we brave the cold weather to remember the people whom braved an oppressive regime and paid the ultimate sacrifice for Bangla and Bangladesh.

shukhobor-february-2020.indd 28 2020-02-19 2:42 AM

প্রতি মাসের খবর OPINION

International Mother Language Day: Why is it important?

|| Jewel ||

"On the occasion of this Day, I launch an appeal for the potential of multilingual education to be acknowledged everywhere, in education and administrative systems, in cultural expressions and the media, cyberspace and trade." - Irina Bokova, UNESCO Director-General

Every year we celebrate this day, but it is important to remember that "Mother language" isn't about a day in a year, it's about a lifetime of language. Like so many of these celebratory days, we take a moment in time to consider an issue that impacts children every day, all year. Here are some facts about why "mother tongue" is important:

1. A child's mother tongue/home language is their primary vehicle of cognitive development in the early years. This is why changing language at school entry is difficult, and often detrimental to, young children. When you take away their strongest language for cognitive processing and put them into a new language, you set them back significantly in terms of what they can understand and learn.

2. This fact correlates with educational research that demonstrates that children who are schooled in a second language, with no access to their mother tongue/home language tend to do less well in school and have lower rates of school attendance in many parts of the world.

3. A child's mother tongue/home language is also an integral part of their character and culture. Not allowing them to use it at school essentially sentences them to who they are within the limits of their second language development, rather than who they are as a whole person.

4. There is no different in value between languages and dialects. No one language is superior to any other, in grammar, vocabulary or expression. Any language with a written script can be used for education, even if it has not traditionally been used in this way. Languages can be developed to meet educational needs if the will (and the funding) is available. Consider all the words that English has had to invent to keep up with the technological revolution: computer, internet, mouse, googling, blogging, vlogging, the list goes on.

5. It is possible to design and implement a broad-spectrum multilingual curriculum, in which children can access learning in their own languages, while simultaneously developing a new school language for further use. It takes time, effort and leadership (and money), but it has been done and can be done again. A brief example is the growth of Mother-tongue based, multilingual education (MTB-MLE) in the Philippines, where diverse communities have been making every effort to provide for community languages to be used in the early years of primary education, rather than an abrupt submersion into English and/or Tagalog at school age.

All of these factors also apply to children in international schools, not only to minority language speakers. There is often a mistaken perception that children in international schools who are in language-immersion situations, without the presence of their mother tongue/home language are somehow exempt from the complications that can arise from going to school in a language you are only learning. This, of course, is not true, and even in high-status international schools children benefit from accessing education in their own language, if not as medium of instruction then by way of robust multilingual classroom practices. We all - parents, educators, administrators, policy makers - need to start paying more attention to our own participation in the dialogue about, and progress towards, a more inclusive education system for all students.

shukhobor-february-2020.indd 29 2020-02-19 2:42 AM

MEANING AND HISTORY OF SHAHID MINAR

The Shaheed Minar (martyr's monument) in Dhaka, Bangladesh, pays homage to the four demonstrators killed in 1952. There have been three versions of the monument. The first version was built on February 22-23 in 1952 but the police and army destroyed it within a few days. Construction on the second version started in November 1957, but the introduction of martial law stopped construction work and it was destroyed during the Bangladesh Liberation War in 1971. The third version of the Shaheed Minar was built to similar plans as the second version. It consists of four standing marble frames and a larger double marble frame with a slanted top portion. The frames are constructed from marble and stand on a stage, which is raised about four meters (14 feet) above the ground. The four frames represent the four men who died on February 21, 1952, and the double frame represents their mothers and country.

By- Jewel

shukhobor-february-2020.indd 30 2020-02-19 2:42 AM

প্রতি মাসের খবর INTERVIEW

Having the Shahid Minar in Beaches-East York is an honour for our community: Brad Bradford

Shukhobor was lucky enough to interview Councilor Brad Bradford for this month's issue. Anyone who follows him on social media knows how hardworking and busy he is working every day to make Beaches-East York a better place. He has been a member of the Bangladeshi community for a short time but has already become our own.

Councilor Bradford's hard work and advocacy for the Bengali community is why we were able to take big strides as a community this past year. As many of you may or may not know, it was his work that got Bangla Town a chance to organize Taste of Bangladesh. It was also his advocacy and the hard work of his office that reignited our goals for a permanent Shahid Minar at Dentonia Park.

Councilor Brad Bradford has done a lot for us in a short time. We owe him a great deal for his hard work. He has spent a lot of time with our community members and has become a good friend for many of us. We thus felt everyone should have a chance to learn about our friend, Councilor Bradford.

We give thanks to Rishab Mehan, Diana Gonzalez, Paul Bieksa, Peter Woodcock, & Councilor Brad Bradford for their hard work and for the interview!

To all our readers, please enjoy this special interview and don't forget to say "hi" when you see him out and about in Beaches-East York!

Q. What got you interested in politics and particularly local government?

Brad Bradford: After working in Toronto's Chief Planner's Office for three years I was tired of partisan politics getting in the way of progress in our City. I ran so I could do my part to make City Hall work better for us, the Beaches-East York community, and all of Toronto's residents. I had also just completed Civic Action's Diverse City Fellowship which also inspired me to put my hand up, be for something, and help elevate the voices of communities often left out of the decision-making process.

I love working at the local government level. There's a tremendous ability to work on the issues that affect people's everyday lives. Toronto is a workhouse government delivering services that we all rely on the water coming through your pipes, your weekly waste collection, and the roads, sidewalks and transit we all use to get around.

Being at this level of government gives me an opportunity to form real, meaningful relationships with my community. My time isn't divided between Queen's Park or Ottawa.

I'm out in the community pretty much every night and every weekend. Talking to people, listening to what's happening and find ways to help move projects forward. Whether it's helping to make sure we got the approvals for Canada's first Vision Zero pop-up, delivering the permits for the first Taste of Bangladesh, or a new location for an International Mother Language Day monument. It's a privilege to be involved in all of these projects and work with neighbors to solve problems every day.

The capacity to have an impact on the City is only limited by how hard we can work every day. That's motivating and inspiring.

shukhobor-february-2020.indd 31 2020-02-19 2:42 AM

Q. Who are your inspirations and role models?

Brad Bradford: It's probably cliched but I'm inspired by Barack Obama, as a politician, as a leader and as a person. I align with his policy-oriented approach to politics, and his ability to build coalitions.

In reality, I'm inspired every day by the people in my life: friends, family and peers. Doing this work you meet people from all walks of life playing their part in making our community stronger and safer.

There are so many leaders and groups making change in Beaches-East York. I was a member of some of them before I ran from Council. Groups like Danforth-East Community Association are a great example of the people who inspired me to come to City Hall and take a lead.

Q. It seems like every day you are attending some event in Beaches-East York. Clearly the BEY community is huge and there is a lot to do almost every weekend. What kind of things have you attended and enjoyed that our Bengali readership might not know about in BEY?

Brad Bradford: One of the best parts of representing a community as large and diverse as Beaches-East York is all of the energy people bring to community events and projects.

I've had the chance to do some fun activities as a City Councilor. Some highlights include a jack.org's November "polar dip" in Lake Ontario to raise funds for youth mental health, throwing the first stone of the season at our very own East York Curling Club, marching in the Easter Parade and Canada Day Parade, and the Coldest Day of the Year bike ride. I also encourage everyone to go out to see the Winter Stations at Woodbine Beach which brings together artists from all over the world to create interactive exhibits. This year's theme is "Beyond the Five Senses" and I was honoured to be on the judging committee. It will open on February 17th, hope to see you there!

The best part is, there are lots of ways to get involved in shaping the community and helping to put on events. If you want to help shape our main streets, you can get involved in my working group or our Business Improvement Areas, if you want to shape the way new development changes our neighborhoods you can join one of our many incredible community and resident associations. If you're interested in volunteering, giving back or supporting local services, you can join groups like Community Centre 55 which organizes a wide mix of events and programs for residents across the ward.

I encourage everyone to sign-up for my newsletter for comprehensive information on the events and initiatives happening in the community at bradbradford.ca/newsletter or follow me on social media!

Q. Taste of Bangladesh has always been a dream of ours and became a reality thanks to you. How did it feel seeing so many members of your ward, of Councilor Crawford's ward, and around the city together?

Brad Bradford: No community has welcomed me more warmly and with more open arms than the Bengali community in BEY. I am so grateful to every

East York Canada Day Rally

Nate, Tory and Brad in boishakhi celebration festival (from left)

shukhobor-february-2020.indd 32 2020-02-19 2:42 AM

Brad in a Bengali Communities Program

community member who has made me feel like a part of your family over the last year. An event like Taste of Bangladesh, as you said, brings so many new faces into our area to see what the BEY has to offer. I am always telling the people I meet that we have Canada's largest Bengali population in our area. Seeing our community host a city-wide and regional celebration filled me with pride.

Coming together to celebrate our diversity is such a big part of what it means to be a Torontonian and a Canadian. Being a host is a big honour and I am so grateful that we had this honour in our community, and that we have the kinds of leaders who can bring thousands of people from across the GTA to celebrating Bangladeshi cultures.

I am looking forward to hosting next year. The event is a great opportunity to meet new people and start to build some new relationships. My goal is to bring more people out to the event, Bengali and non-Bengali so we can celebrate and showcase Bengali culture for everyone in the city, deepen our existing connections and strengthen new ones. Plus – everyone needs to taste the delicious Bengali delicacies. More payesh and mishit doi for everyone!

Q. For nearly 2-decades we have been paying our respects for the Language Martyrs in Bangla Town at Ghoroaa Restaurant. Now with your help, we are on our way to have a permanent structure at Dentonia Park. You know the story of the Shahid Minar and what it means for members of your ward, how do you feel about having the permanent Shahid Minar in Beaches-East York?

Brad Bradford: Bangladesh and the Bengali language have a strong history, and I'm incredibly proud to represent that here in BEY. Culture is important – it's a part of what makes us unique. Celebrating it and in diverse ways is what makes us Torontonians and Canadians.

Having the Shahid Minar in Beaches-East York is an honour for our community and me as a City Councilor. It shows just how important this area is for Bengali culture not just in Toronto but in Canada. The monument will be the spiritual home of the Language Martyrs in our community. It will bring people together to learn more about people and histories that they might know much about. I hope schools and community groups will come to visit the monument and learn about its significance. Those opportunities are what makes Toronto an incredible place to live.

shukhobor-february-2020.indd 33 2020-02-19 2:42 AM

Q. You are greatly respected in the community and have become like our own. How do you wish to continue to grow this relationship?

Brad Bradford: The Bengali community has shown me so much kindness and warmth. You've welcomed me with open arms, and we've accomplished so much together already. I am so grateful. There's a lot to do still. We have to make our stretch of Danforth East the official Bangla Town, we need to get all the funds raised needed to get the IMLD monument done in 2020, and we have got more Bengali youth engaged in leadership at the city.

The community's voice and priorities are much more important than mine. So I want to grow our relationship by hearing from you. I want to see more of our Bengali community at events, at public meetings, and at City Hall. Again, engaging youth is critical. Politics is generational and as one of the youngest members of City Council, I here to make long-term decisions so that our generation builds an even better Toronto than the one we inherited. Come out to my community meetings, follow me on social media, and stay plugged-in to all of the ways you can make an impact.

I'm looking forward to continuing my support for events like IMLD, Taste of Bangladesh, Bengali New Year and the many grassroots initiatives like making Ramadan food baskets, your Victory Day celebrations, and Pitha festival.

Q. How do you feel about recognizing Bangla Town permanently in the future?

Brad Bradford: We can't get Bangla Town soon enough!

One of the greatest parts about Toronto is that we have these cultural neighborhoods. Greektown, Little Italy, Portugal Village – all of these provide an area for the community to come together and celebrate their culture. I think the more we have of these cultural centers, the better.

I'm working with the local businesses and City staff to get Bangla Town done. We're going to need the community's input on the features and landmarks that will tell everyone when they come to this part of the Danforth that they've arrived in Bangla Town and that they're experiencing the vibrancy of Canada's largest Bengali population.

Q. Lastly, do you have anything to say for our readers?

Brad Bradford: Thanks for reading! Thank you for support the work that Rafee and his team at Shukhobor is doing. Organizations and publications like this are the heart and soul of our identity. While media is changing rapidly, the underlying principles are rock-steady. We want to stay connected to each other and we want to see a better world.

As politicians, community leaders, businesses, and media, we can and should always work together. I hope you will be in touch with me to help achieve the change you want to see in our community. If you have any ideas on how we can make our community a better place – reach out to my office. I can be reached at ***Councillor_Bradford@toronto.ca*** or ***416-338-2755***. I'm also on Facebook, Twitter, and Instagram if you want more frequent updates on what's happening in our neighborhoods, or sign-up for my biweekly newsletter at ***bradbradford.ca/newsletter***.

Brad Bradford

shukhobor-february-2020.indd 34 2020-02-19 2:42 AM

প্রতি মাসের সুখবর OPINION

MEMORIES OF TORONTO'S FIRST SHAHID MINAR

|| RAFEE SYED ||

I am a Norwegian-born Canada-raised man of Bangladeshi descent. I guess if you look at my birth certificate and citizenship documents that is after all how you would describe me. Truthfully in my heart I consider myself a Bangladeshi-Canadian like many of you our readers. Despite my birth, despite growing up here, in my heart of hearts I feel my Bangladeshi heritage is what makes me who I am. I love my shutkhi bhortha, I love watching Apurba's thousandth Natok with Tanjin Tisha with my mom, heck I even love using my arsenal of Bengali words when yelling at the driver who cuts me off going down Kingston Road. Most of all, I love the history of our Bangladesh and I love the growth of our Bengali community here in Bangla Town.

I was about 6 years old when I first learned about the Shahid Minar. By that point our small community had been commemorating our Language Martyrs behind Priyangan which is now Ghoroaa Restaurant for a couple of years. Despite our small community, word spread about the temporary monument on the Danforth and whomever could make it, made their way in the cold and in the snow to pay their respects. I recall seeing old photos from the early Ekushey February ceremonies, photos of maybe 50-100 people coming together for our Language Martyr's in the early days of our Bangla Town. In a way it was eye-opening to see the love these people had for their country and for their people, the people whom paved the way for a language and for a nation.

I credit a lot of my appreciation for my heritage and country to my parents. From an early age it was instilled to speak Bangla in the house, English can be practiced for homework and in school or with my friends. I learned to love all Bangladeshi cuisine thanks to my mother, although that is probably due to her skills in the kitchen. My father I am especially grateful to for teaching me about our history. He taught me from a young age the struggle of our brave students in 1952 and our brave leaders in 1971. Not only did he teach me about the history but he taught me about how we commemorate them every year from a young age.

Fast forward a few more years and I am able to not only attend the midnight ceremony but also help. I look forward to it every year, much like I look forward to Pohela Boishakh. It brings me great joy when I get to work alongside my father and the committee of uncles to clear the snow, break the ice, and yes, salt the driveway, and finally bring over the Shahid Minar to stand tall in our dear Bangla Town. In a way, it feels like my own way of saying "Thank you" to the brave men & women who stood for us, whom in my opinion, are the greatest generation of Bengalis to have walked this earth.

Every year for one night only we get to see the heart & soul of our Bangla Town come alive for the

shukhobor-february-2020.indd 35 2020-02-19 2:42 AM

Shahid Minar. To hear everyone, sing “Amar Bhaiyer Rokte Rangano” together makes it worth it every year regardless of the weather conditions to put together our temporary monument. After a long night, hearing that song reinvigorates us to do it all over again the following year. To also see the crowd, grow each year is so beautiful and motivating to see. Our Bangla Town and our Bangla community grows every year. From all reaches of Toronto and beyond and yet every year we come back together in Bangla Town and pay our respects.

It has been like a dream the last ten years working together with my father and the committee organizing our Ekushey February ceremony. I merely joined in helping nearly 11 years ago at the age of 15 in high school and at last we are doing the final Shahid Minar on Danforth and I am 26, graduated and soon to be married. I give thanks to all the committee members who have worked to make this night so successful. I give thanks to all those who join every year to pay their respects. Nearly 24 years of remembering our heroes, our Language Martyr’s and our sweet celebration has elicited the need for a permanent Shahid Minar. What was once our Language Monument, will now become the monument that speaks for all of Toronto and it’s diversity.

Although I will miss the work myself, my father, and the other uncles would do together for 2 weeks in February. I look forward to the momentous success we are gearing to achieve. I am filled with pride for our community and for what it has become. I think of how much Bangla Town has changed since its humble beginnings in 1996. There was a time when there was just 2 Bengali stores on the Danforth. Priyangan opened by my father Syed Shamsul Alam & Farhad Uncle as well as Probashi Bazaar owned by ‘Shahid Uncle’. These were where the few Bengalis congregated. Roughly 10-15 men and their families were all there was of a Bengali community. Now look at us.

Taste of Bangladesh, the permanent Shahid Minar, officially recognizing Bangla Town soon, the many stores lining the Danforth, successful businessmen and women and professionals, so much has changed and so much growth has taken place. I am proud to call myself a Bangladeshi and to consider myself your compatriot.

I give thanks to the committee whom made the Danforth Ekushey February ceremony a success. I give thanks to the attendees as it was their attendance that warranted the argument for a permanent Shahid Minar. I give thanks to the committee members & Councilor Brad Bradford whom will make the permanent Shahid Minar a reality. I give thanks to all of you whom make Bangla Town the vibrant community it isI give thanks to all of you whom continue to speak Bangla and teach your children Bangla. I especially this month and forever, give thanks to the people whom were only a few years older than me who sacrificed their lives for our mother tongue. Our language is the legacy of poets Rabindranath Tagore, Kazi Nazrul Islam, our Language Martyrs, our Independence Martyrs. We honour them and our many heroes every day by speaking Bangla.

Let us together commemorate all of them, remember their contributions and sacrifices all over again, let us protect and preserve Bangla, our graceful language, and let us go unto the next year, build our permanent Shahid Minar, recognize our Bangla Town, celebrate our Taste of Bangladesh, and make our martyrs proud.

shukhobor-february-2020.indd 36 2020-02-19 2:42 AM

একুশের সমকালীন কবিতা

বর্ণমালার ঘ্রাণ

কালো শ্লেটে চককাঠি ভাঙা বর্ণমালা
যেন অবুঝ শৈশবে কুড়ানো এক-একটি শিফালি।
কাঁধে কাঁধ রাখা শব্দগুলো যেন দিগন্ত কাশফুল,
সেখানে খনা ও পদ্মবাতী খেলা করে জলতরঙ্গে।

জটবাঁধা অক্ষরগুলো কারুশিল্পের লতানো নকশা
জটের কপাট খুলে দিলে পরে-
আজও ভেসে আসে চর্যাপদের গুমোট গন্ধমাখা পাণ্ডুলিপির ঘ্রাণ।
মৃন্ময় গন্ধে ভেসে বেড়ায় হাজারও শীকর
হাজারও পথ হেঁটে ফিরে ফিরে আসে লোকজ প্রবাদ-প্রবচন।

বাংলার জঠরে বাস করে আজও অগন্তি ভিনদেশি ভ্রূণ
তবুও সবাইকে দিয়েছে তার মাতৃত্বের অধিকার।

জনাকীর্ণে ও জনান্তিকে যাবতীয় বাংলা-নকশিকাঁথা
বর্ণমালার স্বর্ণসুচে মায়ের ভাষায় গাঁথা।

- অঞ্জন আচার্য, *কবি, সাংবাদিক। ঢাকা।*

ভাষার কথা

লোকে ভাষা হারিয়ে ফেলে,
ভাষা হারিয়ে কোথায় যায়?
অচিন পাখির পালকে খুঁজি
লোকে ভাষা কোথায় পায়?

ভাষার খোঁজে দেবদারু বন
দাবানলে পুড়েছে কতবার হায়
ভাষা যখন হারিয়ে যায়
তখন মানুষটাও মিলিয়ে যায়।

ভাষার ওষ্ঠাধরে রেখেছি ঠোঁট
সুধা আসেনি, দিন ফুরায়ে যায়
ভাষা যখন থাকে না কাছে
ভাষা হারিয়ে আসলে কোথায় যায়?

ভাষার বাড়ি যাইনি কখনো
তার বাড়িতে নাদান বাসনা যায়
ভাষা ঘুরে বেড়ায় ধরা-অধরায়
ভাষা হারালে, ভাষা কি ফিরে পায়?

- বিধান রিবেরু, *কবি, ঢাকা।*

ওরা দীপ্ত ধ্রুবতারা

বাংলা আমার মায়ের ভাষা
বাংলা আমার মনে,
বাংলা আমার প্রতি কথার
শুদ্ধ উচ্চারণে।

শত শহীদের রক্তে ভেজা
সবুজ নরম ঘাসে,
কৃষ্ণচূড়া রঙিন হলো,
ফেব্রুয়ারী মাসে।

কোকিল ডাকা,শাপলা ফোঁটা
শিমূল ঝরা মাসে,
"একুশ" এলেই মনটা আমার
শোক সাগরে ভাসে।

ভাষার জন্য শহীদ সেনা
দিয়েছিলো প্রান,
এতবছর পরেও তা,
হয়নি ম্রিয়মান।

ভাষার জন্য অনায়াসে
শহীদ হলো যারা,
ঐ আকাশে তাকিয়ে দেখো
ওরা "দ্বীপ্ত ধ্রুবতারা"।

তাদের জন্য সাজিয়ে দিলাম
রঙিন ফুলের ডালা
দাঁড়িয়ে আছি হাতে নিয়ে
পলাশ ফুলের মালা।

লড়াই করে ভাষার জন্য
তারা দিলো প্রান
জীবন দিয়ে রাখতে হবে
"বাংলা ভাষার"মান।

জীবন দিয়ে রাখতে হবে
"মাতৃভাষার মান"।

- মুনিরা সুলতানা মিলি, *লেখক, উপস্থাপক, আবৃত্তিশিল্পী ও সংগঠক। টরন্টো, কানাডা।*

shukhobor-february-2020.indd 37 2020-02-19 2:42 AM

প্রতি মাসের সুখবর OPINION

YOUTH'S OPINION ABOUT TORONTO'S DIVERSITY AND PERMANENT SHAHID MINAR

A permanent Shahid Minar aka Martyr's Monument will come to fruition soon in Toronto. This structure is a monument not only for the struggle of Bangla as a language but commemorates the beauty of all languages and diversity in our city. Growing up in Toronto, you will likely hear many people's mother tongue in a day. Despite many of us growing up speaking English primarily, our mother tongue is a big aspect of our personal growth and connection to our heritage. How do you feel about Toronto's diversity and secondly, how do you feel about a permanent Shahid Minar in Toronto? Will you visit it?

"Diversity is what makes Toronto, Toronto. Each part of the city has its own identity and culture. From old, established communities like Greek town, China Town to new emerging ones such as Bangla town. Being able to express oneself in their mother tongue plays a vital role in preserving culture and establishing these communities, and the sheer number of languages spoken in Toronto makes it the perfect place to build a permanent replica of Shaheed Minar, a monument that commemorates those killed for trying to preserve their mother tongue in the Bengali Language Movement in 1952."

- Waseem Ahmed

"Toronto's diversity is what makes our city special and I am very proud of that. Living in Toronto, I have learned many different cultures and that made me realize how different we all are. By learning new cultures, it brings us new experiences and bring different communities together. As for the permanent Shahid Minar, I believe it will be amazing for the Bengali community. The Shahid Minar represents our history and heritage, we should remember the great struggles that Bangladesh has gone through and this will help us to remember that we should respect each other."

- Nobel Abbas

"I think Toronto's diversity is a great thing, you're able to learn about many different cultures and people on a daily basis. Diversity makes people understand each other better and connect experiences between one another. A permanent Shahid Minar in Toronto would allow other cultures learn about Bengali culture as well as serve a purpose for Bengali people to have a piece of home away from home itself."

- Nahin Chowdhury

"Toronto's diversity allows us to build deeper connections with each other and the rest of the world through exposure to different cultures and languages. Our city's multiculturalism helps us gain a better understanding of and compassion for the issues and histories that are unique to different communities. Connections with Toronto's Bangladeshi diaspora brings us closer to our mother tongue and roots. With Toronto's strong Bangladeshi community, we get the opportunity to learn about the different dialects and districts of Bangladesh from each other. I am so proud and happy that the Shahid Minar will be built in Toronto. It will give our community a beautiful space to pay tribute to our freedom fighters."

- HJ

"Toronto's diversity is what makes us unique, not because of the various cultures in this city but the deeply mended appreciation we have for each other. I have been to many cities with quite a good multicultural background, but none like Toronto wherein everyone has an appreciation for the different aspects of each culture. Not only do we have the privilege of growing up in a truly international city, but we have the privilege to meet people of other nationalities and learn about their nation's struggles just like many will get to learn about Bangladesh and the Shahid Minar.

Regarding the Shahid Minar, I am so proud that there might be one in Toronto. I will for sure visit it but will make sure one day to show my children as well. Our struggle for our language and our independence is such an unique story and one I am very proud of. I can only wonder what our martyrs, our heroes would think if they knew their struggle would be recognized permanently in Canada among many other nations."

- MN

shukhobor-february-2020.indd 38 2020-02-19 2:42 AM

প্রতি মাসের খবর

ফিচার

বাংলা টাউনে ভাষার মিনার, ভালোবাসার মিনার

॥ রাশেদ শাওন ॥

ছোটবেলায় স্কুলের পাঠ্য বইয়ে পড়া 'দশের লাঠি একের বোঝা' প্রবাদ বাক্যটিকে নিয়ে যে কাঠের সাঁকো বানানোর গল্প পড়েছি এই গল্পটিও অনেকটা তেমনি। কেউ উদ্যোগ নেন। কেউ সাহায্য করেন অর্থ দিয়ে। তরুণেরা যোগ হন কায়িক শ্রম দিতে। আর অন্যরা ভালোবাসা নিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে সমেবেত হন। সকলের উদ্দেশ্য একই। ১৯৫২ সালে মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠার দাবীতে যারা আন্দোলন করতে গিয়ে শহীদ হয়েছিলেন তাদেরকে শ্রদ্ধা জানানো। সেই সাথে সংগ্রামের বিনিময়ে যে গৌরব অর্জন করেছিল বাংলা ভাষা সেই গৌরবের দিনটিকে উদযাপন করা। পৃথিবীর সকল মাতৃভাষাকে সম্মান জানানোও এর আরেকটি উদ্দেশ্য।

এ আয়োজনের মূল উদ্যোগ নেন কমিউনিটির সর্বজন শ্রদ্ধেয় সৈয়দ শামছুল আলম ও তার গড়ে তোলো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান টরন্টোর নামকরা দেশি খাবারের দোকান ঘরোয়া রেস্টুরেন্ট। তাঁর সাথে শুরু থেকেই যুক্ত আছেন গোলাম সরোয়ার, মুজাহিদুল ইসলাম, মাহবুব চৌধুরি, সাদ চৌধুরি, সাইদুল ফয়সাল, কফিল উদ্দিন পারভেজ, খোকন আব্বাস, রাশেদ বাবু প্রমুখ।

এই আয়োজনের মূল উদ্যোক্তা, সকলের প্রিয় আলম ভাই জানান একুশে উদযাপনের শুরুটা হয়েছিল ১৯৯৮ সালে। অনেকটা আড্ডার ছলে আলাপআলোচনা থেকেই প্রথম শহীদ মিনার তৈরির পরিকল্পনা হয় ঘরোয়াতে বসে। এর পর তা ডালপালা ছড়াতে থাকে দিনে দিনে। তার পরিচিতরা ও কয়েকজন বন্ধুবান্ধব মিলে সে বছর প্রিয়াঙ্গন চত্বরে নির্মাণ করেন ঢাকার কেন্দ্রিয় শহীদ মিনারের আদলে একুশ উদযাপনের ভালোবাসার মিনারটি। সেই যে শুরু, সেই থেকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রায় দুই দশক ধরে টরন্টো শহরের সর্বজন বিদিত ভাষা শহীদ দিবস উদযাপনের সর্ববৃহৎ আয়োজন এটি। এই আয়োজনে এখন অতিথি হয়ে আসেন সিটি অব টরন্টো'র মেয়র, কাউন্সিলর থেকে শুরু করে অত্র এলাকা সাংসদ ও এমপিপিও। সৈয়দ আলম গল্পের ছলে জানান, গত পাঁচ বছর ধরে মেয়র জন টরি উপস্থিত থাকেন একুশে ফেব্রুয়ারির প্রথম প্রহরেই। তিনি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে সিটির পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে বায়ান্ন এর ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আসছেন গত পাঁচ বছর ধরেই। তার সঙ্গে অংশ নিয়েছেন যখন যিনি ওয়ার্ড কাউন্সিলরের দায়িত্ব পালন করেছেন তারাও।

'সচরাচর ফেব্রুয়ারিতে কানাডায় খুব ঠাণ্ডা থাকে। কোনো কোনো বছর এ সময় প্রচুর তুষারপাত হয়। গত বছরও ফ্রিজিং রেইন হল। একবারতো এত বরফ পড়ল যে তা সরাতে সিটির স্মরণাপন্ন হতে হল। শেষে সিটির বরফ সরানোর গাড়ি দিয়ে অনুষ্ঠানস্থল পরিষ্কার করা হয়েছিল। তারপরও তীব্র শীত উপেক্ষা করে এই আয়োজনে স্থানীয় সাংসদসহ অনেক সরকারি দায়িত্বশীলরা অংশ নেন। সব প্রতিকূলতা ছাপিয়ে এই আয়োজনে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা শ'য়ের ঘর ছেড়ে সহস্রাধিক হয়েছে দুই দশকে। এ জন্যে তো প্রায় প্রতি বছরই ঘরোয়ার নামে পুলিশের কাছে অভিযোগ যায় নেইবারহুড থেকে। সঙ্গত কারণে পুলিশও জেনে গেছে এই আয়োজনের কথা। টরন্টো সিটি পুলিশ এখন আমাদের স্বেচ্ছায় সহযোগীতা করে আয়োজনটি সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে।' জানান সৈয়দ আলম।

অনুষ্ঠানের ব্যাপ্তি বোঝাতে গিয়ে তিনি যোগ করেন, সিটির নিয়ম অনুযায়ী রাতে যেকোনো আয়োজনে শব্দের মাত্রা বেঁধে দেওয়া হয় ৮৫ ডেসিবেলের নীচে। এই আয়োজনে আমন্ত্রিতরা শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন আয়োজনস্থলে দাড়িয়ে। সেজন্যে আমরা কোনো সাউন্ড সিস্টেম ব্যবহার করি না। তবুও এক দেড় হাজার লোকের জামায়েত হয় বলেই পুরো এলাকা সরগরম হয়ে যায়। গত কয়েক বছরতো ভিড় সামলাতে গিয়ে আমাদের হিমশিম খেতে হচ্ছে। তাই ছোট ছোট ফেন্স বসিয়ে সমাগতদের লাইন ঠিক রেখে শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদনের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হচ্ছি আমরা। যদিও এ নিয়ে আবার অনেকেই না বুঝে আয়োজকদের সমালোচনা করছেন। বলছেন, আমরা সিটির টাকা নিয়ে সেখান থেকে বাড়তি আয় করছি। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। এই আয়োজনে কমিউনিটির বাইরে অন্য কারও কাছ থেকে কোনো অর্থ আসে না। আর

shukhobor-february-2020.indd 39 2020-02-19 2:42 AM

আমরা যদি শৃংখলা রক্ষা না করতে পারি তাহলে আমাদের আয়োজনের যে সুনাম আছে সেটিও নষ্ট হতে বাধ্য।'

জানা যায়, শুরুতে কাঠের কাঠামো বানিয়ে তা জোড়া লাগিয়ে শহিদ মিনার তৈরি করা হত। প্রথমবার এটি তৈরি করেন জাহিদ। তিনি কাঠের কাজ ভালো জানতেন। আহসান নামের এক তরুণও যুক্ত ছিলেন। তখন স্তম্ভগুলো ছাড়া কোনো পাটাতন ছিল না। আয়োজন শেষে কাঠামোগুলোর জোড়া খুলে তা রাখা হত ঘরোয়া রেস্টুরেন্টের বেজমেন্টে। সেটা শুরুর কয়েক বছর পারা গেছে। কেননা তখন কাঠামোটির উচ্চতা সাত-আট ফুটের বেশি ছিল না। পরে পর্যায়ক্রমে স্টেজ যুক্ত করা হয় মূল আদলের সাথে। এখন শহীদ মিনারের উচ্চতা চৌদ্দ-পনের ফুট। এটি নিয়মিত তৈরি করা হচ্ছে গত সাত-আট বছর ধরে। এখন তা এতটাই বৃহৎ আকারের যে সংরক্ষণের জন্যে নির্দিষ্ট কোনো জায়গা পাওয়া যায় না। সাজানো, মঞ্চ তৈরি করা, বরফ পড়লে তা সরানো, চলাফেরার রাস্তা ঠিক করা- এমন নানা ধরনের কাজ করতে হয় প্রতি বছরই। এক কথায় আয়োজনটি ঘিরে এক এলাহি ব্যাপার।

এত বড় লক্কা কাণ্ডের অর্থের যোগান আসে কোত্থকে? জানা যায়, মূল খরচ দিয়ে থাকে ঘরোয়া রেস্টুরেন্ট। তার সাথে কমিউনিটির অনেকের কিছু কিছু করে সাহায্য সহযোগিতায় এটি তৈরি করা হয়। শুরু থেকেই তরুণরা মূলত স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে থাকেন পুরো আয়োজনটি সফল করে তুলতে। বিশেষ করে গত কয়েক বছর ধরে নিরলস পরিশ্রম করেন রাফি, সাকিব, জিন্নাহ, দ্বীপ প্রমুখ। অন্য অনেকেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শ্রম দিয়ে পুরো আয়োজনটি সফল করে তোলেন।

সৈয়দ আলম আরো জানান, আয়োজনটি তার নিকট এতটাই

অন্যান্যদের সাথে ভাষাশহীদের শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন সিটি মেয়র জন টরি (বাম থেকে দ্বিতীয়)

২০১৯ সালের শহীদ মিনার

শহীদ মিনারে সাংসদ নাথেনিয়েলের প্রদান করা পুষ্পস্তবক

শহীদ দিবস সম্পর্কে কেনেডিয়ান সংবাদ মাধ্যমকে অবহিত করছেন সৈয়দ আলম

এটি তৈরি করা হয় একটি ফার্নিচার কারখানায়। এর পর তা রাখা হয় গোলাম সরোয়ারের বাসায় পার্কিংয়ের দখল নিয়ে। তিনিও এটি মেনে নিয়েছেন কমিউনিটির স্বার্থে।

বছর ঘুরে যখন ফেব্রুয়ারি আসে তখন সেই কাঠামোকে স্থাপন করা হয় যথাস্থানে। ঘরোয়ার পার্কিং পরিষ্কার করা, শহীদ মিনারের কাঠামোতে নতুন করে রঙ করা, বর্ণমালা গুলো মূল স্তম্ভের গায়ে গুরুত্বপূর্ণ যে এটি তার প্রতি বছরের অবশ্যই করণীয় কাজের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে। তাই বছরের এই সময়ে তিনি নিষ্ঠার সাথে কাজটি করার জন্যে সবধরনের পৃষ্টপোষকতা দিয়ে যাচ্ছেন নীরবে। সঙ্গত কারণে শহীদদের স্মৃতির মিনারটি তার কাছে হয়ে উঠেছে মাতৃভূমিকে ভালোবাসার মতোই এক ভালোবাসার মিনার।

shukhobor-february-2020.indd 40 2020-02-19 2:42 AM

প্রতি মাসের সুখবর সাক্ষাতকার

পরের একুশ উদযাপন স্থায়ী শহীদ মিনারে করা যাবে ঃ রিজওয়ান

*রিজওয়ান রহমান। টরন্টো শহরে বাংলাদেশিদের কাছে প্রিয় মুখ। শত প্রতিকূলতার মধ্যেও তিনি একজন সফল সংগঠক ও উন্নয়ন কর্মী। তরুণদের নিয়ে কাজ করছেন দীর্ঘ দিন ধরে। কাজ করছেন বাংলা কমিউনিটির নানা ইতিবাচক বিষয় নিয়েও। তবে টরন্টোতে স্থায়ী একটি শহিদ মিনার নির্মাণের প্রত্যয়ে নিরিলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন বেশ কয়েক বছর ধরে। এ লক্ষ্যে গঠিত সংগঠন টরন্টো আইএমএলডি-এর পরিচালকের দায়িত্ব পালন করে আসছেন নিষ্ঠার সাথে। এক কথায় বলতে গেলে, এই তরুণ তুর্কি টরন্টোতে স্থায়ী শহিদ মিনার নির্মাণের কাজে বাংলা কমিউনিটি ও স্থানীয় সরকারের মধ্যে সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করছেন গত ৫ বছর ধরে। সম্প্রতি **সুখবর**'র কার্যালয়ে এসেছিলেন তিনি। সে সময় প্রতি মাসের সুখবর ও সুখবর ২৪ ডটকম'র এডিটর ইন চিফ **রাশেদ শাওন** এর সাথে একান্ত আলাপচারিতায় অংশ নেন। সেই আলাপচারিতার চুম্বক অংশ এখানে তুলে ধরা হল।*

সুখবর: *টরন্টোতে কত বছর হল আছেন?*

রিজওয়ান: কানাডায় দশ বছর হবে, এ বছর মার্চে। শুরু থেকেই এই শহরে বসবাস করছি।

সুখবর: *শুরু থেকেই কি কমিউনিটির সাথে কাজ করছেন?*

রিজওয়ান: বাংলা কমিউনিটির সাথে কাজ করছি ২০১৪-এর শুরু থেকে। যখন কানাডায় আসি তখন অন্যান্য প্রবাসীদের মতো আমারও পরিকল্পনা ছিল শুরুর তিন-চার বছর কাজ করব নিজে থিতু হবার জন্যে। তারপর অন্য পরিকল্পনাগুলো নিয়ে এগোবো। সেক্ষেত্রে আমি শুরুতেই ভালো চাকরি পাই, সেখানে ভালো অবস্থানে যাই। তার পর সিদ্ধান্ত নিই মানুষের জন্যে কাজ করার। এ পরিকল্পনা আগে থেকেই ছিল। পরিকল্পনা মত ধীরে ধীরে কাজ শুরু করি। তখন ড্যানফোর্থ এভিনিউ'র উপর 'বাংলা টাউন' খ্যাত এলাকায় থাকতাম না। থাকতাম মিসিসাগায়। খোঁজ করলাম কমিউনিটিতে কি ধরনের কাজ হচ্ছে। পত্রিকাগুলো পড়ে কমিউনিটি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করলাম। বিভিন্ন ইভেন্টগুলোতে গেলাম। এরপর সিদ্ধান্ত নিলাম বাংলা কমিউনিটির সাথে কিছু একটা করার। শুরুতে একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত হই। তারা চাকরিপ্রার্থীদের নিয়ে কাজ করত। যারা চাকরি খুঁজত তাদের বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগীতা করত।

সুখবর: *দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে কমিউনিটির কিছু মানুষ বাংলা ভাষা ও ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা জানিয়ে ফেব্রুয়ারির ২১ তারিখে অমর একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করে আসছেন। তাদের সাথে আপনার সম্পৃক্ততা কি তখন থেকেই?*

রিজওয়ান: ২০১৪-এর যখন থেকে কমিউনিটিতে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ শুরু করি তখন থেকেই এই আয়োজনে অংশ নিতে শুরু করলাম।

সুখবর: *ভাষা দিবস উদযাপনের অনুষ্ঠানটি কি শুধু ঘরোয়া রেস্টুরেন্টের পাশে পার্কিং লটেই হত নাকি অন্য আরও অনুষ্ঠান হত সে সময়?*

রিজওয়ান: প্রথম যখন এই আয়োজনের সাথে যুক্ত হই তখন *ঘরোয়া*র আয়োজনের সাথেই যুক্ত হই। তবে বিভিন্ন সময় নানাজন বিভিন্নভাবে স্বপ্রণোদিত হয়ে ভাষা দিবস পালন করেছে।

কিন্তু '*ঘরোয়া*'র একুশে উদযাপনের অনুষ্ঠানটি হল বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে যে আয়োজন হয় তেমন। দেশেও পাড়ায় মহল্লায় একুশের অনুষ্ঠান হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয়ভাবে ঢাকা মেডিকেলের পাশে জাতীয় শহীদ মিনারে ফেব্রায়ারির ২১ তারিখের প্রথম প্রহর থেকে যে আয়োজন হয় এটি তেমন।

কানাডার টরন্টোতে *ঘরোয়া* রেস্টুরেন্টের পাশে যে আয়োজন সেটি হল প্রধান ও মূল আয়োজন। আমি তেমনটিই দেখে আসছি।

shukhobor-february-2020.indd 41 2020-02-19 2:42 AM

মিষ্টার রিজওয়ান রহমান

সুখবর: *আপনার জানা মতে এই অনুষ্ঠানের আয়োজক কারা ছিলেন?*

রিজওয়ান: এই আয়োজনে ফরমাল কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল না। মূলত সৈয়দ শামছুল আলম ভাই এবং ওনার ঘনিষ্টরা মিলে আয়োজনটি করে থাকেন।

তবে আমরা সবাই জানতাম, আয়োজনটি হবেই। সেই মত অন্যরা সকলে ফেব্রুয়ারি এলেই খোঁজ খবর শুরু করতাম। কিভাবে, কোথায়, কখন আয়োজনটি হবে তা জেনে নিতাম। এখনও যেমনটি করি প্রতিবছরই। নিজেরাই আসি ওনার কাছে, আলম ভাই কি করছেন বা কি করবেন- তা জানতে।

পুরো আয়োজনটিই *ঘরোয়ার*। আমরা শুধু আয়োজনের সাথে আসি সেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করতে। সেটা হতে পারে কারপার্কিং এলাকা ঝাড়ু দেওয়া বা স্টেজে কাজ করা। এমনকি ব্যাকগ্রাউন্ডে রং করাও। এটাকে ভলেন্টারিজম বলছি এ অর্থে যে একুশের উদযাপন অনুষ্ঠানের সময় এমন অনেককেই দেখা যায় যে যারা সারা বছর এখানে আসেন না আর আসলেও হয়তো চা-টা খেয়ে চলে যায়। ওনাদেরকে একুশের আয়োজনের সময় নানা স্বেচ্ছাশ্রম দিতে দেখা যায়। এভাবেই টরন্টোর *ঘরোয়ার* একুশের অনুষ্ঠানের সাথে সর্বসাধারণের সংযোগ তৈরি হয়েছে।

সুখবর: *এই যে স্বপ্রণোদিত হয়ে একুশ কে উদযাপনের অনুষ্ঠান থেকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক ফরমেটের মাধ্যমে শহীদ মিনার তৈরির পরিকল্পনাটি কিভাবে শুরু হল?*

রিজওয়ান: আমি বলব এখানে দুটি সমানন্তরাল পথ এক সাথে মিশেছে। একটি হল ঐতিহ্যগতভাবে একুশকে উদযাপন; যেটি হয়ে আসছে সেটিতো চলতেই থাকবে আর একটি হল আমাদের স্থায়ী শহীদ মিনার থাকুক সেই স্বপ্নের বাস্তবায়নের একটি প্রক্রিয়া। এই ধারণাটিও কিন্তু নতুন ছিল না। আমার মতে গত ১৫-২০ বছর ধরে নানা পর্যায় অতিক্রম করেই আজকে এই পূর্ণতার পথ তৈরি হয়েছে। পর্যায়গুলো ছিল কখনও ব্যক্তিগত আবার কখনও সংগঠনের আওতায়। তবে দেখা যেত- একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে এসে তা আর সামনে এগোতো না বা থেমে যেত। এখানে আমি একটু খোলামেলাভাবেই বলতে চাই- নাম হয়তো একটা ইস্যু হয়ে যেত যে কে এর নেতা বা কার শহীদ মিনার হবে সেটি; মানে শহীদ মিনারের আগে একটা নাম জুড়ে যেত- এরকম নানা বিষয় যোগ হত। অর্থাৎ শহীদ মিনার ছাপিয়ে ব্যাক্তি নাম বড় হয়ে সামনে চলে আসত। সেখানে ভাষা আন্দোলনের চেতনার জায়গাটি প্রচ্ছন্ন থেকে যেত। এমনকি আমি এমন ঘটনাও জানি যে, সিটি অব টরন্টোর অনুমতি পর্যন্ত হয়ে গিয়েছিল। সেটা ২০১০-১২ দিকের ঘটনা। এর মানে অনেক দূর এগিয়ে যাওয়া। সেটাও বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। আমরা অর্গানাইজেশন এজন্যে করলাম যে, প্রথম কথা হচ্ছে- আপনি যখন সিটি বা সরকারের যে কোনো পর্যায়ের সাথে কথা বলতে যাবেন তারা কিন্তু পুরো কমিউনিটি বা একজন ব্যক্তির সাথে কথা বলবে না। 'ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ অ্যা ফোরাম ইন দ্য প্রোপার অফিসিয়াল ওয়ে'। এটা একটা কারণ ছিল। আর একটা কারণ- কোনো ব্যাক্তির নাম থেকে সরে গিয়ে নিরেপেক্ষ একটি জায়গা থেকে কাজটি করতে পারি কিনা তা চেষ্টা করে দেখা।

যখন একটি কার্যকর ও বড় বোর্ড অব ডিরেক্টর হয় তখনই কারও একক কোনো কৃতিত্ব সামনে আসে না। এটাই ছিল স্থায়ী শহীদ মিনার তৈরির ক্ষেত্রে একটি প্লাটফর্মের আওয়াতায় সব কাজ পরিচালনা করার

shukhobor-february-2020.indd 42 2020-02-19 2:42 AM

মূল উদ্দেশ্য। এটা নতুন কোনো কনসেপ্ট ছিল না। এক্সিটিং কনসেপ্টকে ডেভলপ করে একটা নতুন ফোর্স ইনজেক্ট করা হয় মাত্র।

সুখবর: *সেক্ষেত্রে টরন্টো ইন্টান্যাশনাল মাদার ল্যাংগুয়েজ ডে মন্যুমেন্ট ইনকরপোরেশন কতদিন ধরে কাজ করছেন?*

রিজওয়ান: আমরা কাজ করছি ২০১৫ থেকে। আমাদের এই গ্রুপটি পাঁচ বছর ধরে কাজ করছি। আইএমএলডি যাত্রা শুরু করে ২০১৪ শেষের দিকে ।

প্রথমে আমরা সাক্ষাত করি তৎকালিন বিচেস-ইস্ট ইর্য়ক এর কাউন্সিলর জেনেট ডেভিস-এর সাথে। আদতে আমরা এই সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ততা তখন থেকেই। এর পিছনের বেশ কিছু ঘটনা জড়িত থাকলেও আমি সেখানে ছিলাম না। আমি বলছি আমার ইনভলমেন্ট থেকে। কাউন্সিলরের অফিস থেকে এরপর কমিউনিটির প্রতিনিধিদের ডাকা হয়। আমিও সে সময় একটি মেইল পাই। জেনেট ডেভিস সেই মিটিং কল করে। আমার মনে পড়ে সেই মিটিং-এ কমিউনিটির গণ্যমান্যগণ সকলেই প্রায় উপস্থিত ছিলেন। শুরুতে এই সংগঠনটি ছিল মাত্র তিন জনের। একজন প্রেসিডেন্ট, একজন সেক্রেটারি ও একজন ট্রেজারার। প্রেসিডেন্ট ছিলেন দেওয়ান আজিম, আমি সেক্রেটারি ও ট্রেজারার ছিলেন সৈয়দ বখত। পরে তা বেড়ে হয় নয় জনের কমিটি। এই নয়জন মিলে আমরা বেশ কিছুটা কাজ এগিয়ে নিই। এর পরের ধাপে তা ১৭ জনের কমিটিতে রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে ৩৭জন সদস্য নিয়ে আমরা কাজ করছি। এখান বাংলা কমিউনিটির প্রায় সকল নেতৃত্ববৃন্দ স্থায়ী শহীদ তৈরিতে কাজ করে যাচ্ছেন।

সুখবর: *আপনারা কি শুধু স্থায়ী শহীদ মিনার তৈরি বিষয়টি নিয়ে কাজ করেছেন নাকি অন্য কোনো বিষয় জড়িত আছে?*

রিজওয়ান: আমাদের সংগঠনটির একমাত্র কাজ হল এই মোন্যুমেন্টটি তৈরি করা। এর কোনো অ্যাওয়ারনেস রাইজ করার কোনো বিষয় ছিল না। কোনো সেলিব্রেশনের দায়িত্বও আমাদের নেই। এই সব বিষয়গুলো পরিষ্কারভাবে লিখিত ছিল। এবং আমি যতদিন হল দায়িত্বে আছি ততদিন কিছু বিষয় খুব শক্ত হাতে ব্যবস্থাপনা করেছি। সেগুলোর প্রথমটি হল- কোনো একক নাম না আসা, (এ জন্যে এখন পর্যন্ত এই শহীদ মিনার তৈরির উদ্যোগের ক্ষেত্রে কেউ বলে না যে এটি রিজওয়ানের না আলমের)। দ্বিতীয়টি হল- যেহেতু আমরা স্থায়ী শহীদ মিনার তৈরির জন্যে কাজ করে যাচ্ছি সুতরাং একুশ উদযাপনে আমরা কোনো না কোনো আয়োজন বা উদযাপন করার দায়িত্বটিও আমাদের; এ ধরণের কার্যকলাপ থেকে বরাবরই দূরে থেকেছি। এ ছাড়া একটি স্থায়ী শহীদ মিনার তৈরির ক্ষেত্রে যে ধরণের কাজ আমাদের করতে হচ্ছে এবং তা সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হচ্ছে সেটি নেহায়েত কম নয়। এর মধ্যে ছিল শহীদ মিনারের জন্য আমরা কোথায় জায়গা পাব সিটির কাছ থেকে, সেই জায়গার জন্যে দরদাম করার ক্ষেত্রে সিটির সাথে বোঝাপড়া করে একটা গ্রান্ড আদায় করা, শহীদ মিনারের নকশা কেমন হবে; কেননা সিটি পরিষ্কার করে বলে দিয়েছিল যে নকশা মেনে আমরা কাজটি করি না কেন তা অবশ্য ট্রান্সপারেন্ট হতে হবে। সেটা আমাদেরকে মেইনটেন্ট করতে হয়েছে। এ সব নিয়ে সাধারণদের অনেকেই আমাদের নানা প্রশ্ন করেছেন। কিন্তু আমরা যতদূর এগিয়েছি তা সিটির নিয়ম মেনে এবং সিটির নির্দেশনা অনুযায়ি। তবে সব কিছুর পরে আমাদের ফোকাস একটাই ছিল তা হল শহীদ মিনারটি নির্মাণ করতে আমাদের কি করতে হবে সেই পথে হাঁটা।

সুখবর: *তাহলে মিনারটি তৈরি হওয়ার পর কি আপনাদের কার্যক্রম থেমে যাবে?*

রিজওয়ান: ইয়েস। এ বিষয়েও আমরা খুবই স্বচ্ছ। এবং আমাদের পরিষ্কার সিদ্ধান্ত আছে। এটা শুধু যে থেমে যাবে তাইই নয় সংগঠনটিই পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। যেদিন মিনার নির্মাণের কাজ শেষ হবে এবং তা সিটি অব টরন্টোর কাছে হস্তান্তর করা হবে সেদিন থেকে আইএলএমডি-এর ডিসলভড হয়ে যাবে।

সুখবর: *তাহলে মিনারটির পরিচর্যা ও এর রক্ষণাবেক্ষন কে করবে?*

রিজওয়ান: এখানে সিটির প্রসেস হচ্ছে, শুধু এই মিনারের ক্ষেত্রেই নয় যেকোনো ধরণের মিনার বা আর্টওয়ার্ক হোক না কেন তার যে নির্মাণ ব্যয় সেখান থেকে শতকরা দশ ভাগ অর্থ সিটি তার নিজের কাছে রেখে দেবে। সেই অর্থ দিয়ে তারা ভবিষ্যতে এর পরিচর্যা করবে। সিটি এ ধরণের মিনারের ক্ষেত্রে দায়দায়িত্ব পালন করবে যতদিন এর অস্তিত্ব থাকবে ততদিন। শুধু তাই-ই নয় এর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, কোনো সংস্কারের দরকার হলে তা করা সবই সিটির দায়িত্বে থাকবে।

সুখবর: *মিনার তৈরির পর প্রতি বছরই তো একুশ উদযাপনের একটি বিষয় আছে সেটি কারা আয়োজন করবে?*

রিজওয়ান: এখানে আমার কিছু রিকমেন্ডেশন আছে। তা হল– একুশ উদযাপনের জন্যে একটি কমিটি তৈরি হতে পারে। এটা হতে পারে সার্বজনীন বা কোনো ফোকাসড গ্রুপ। কিন্তু আইএমএলডি অর্গানাইজেশন কোনোভাবে সেখানে যাবে না। কেননা এটার বিলুপ্তি ঘটবে। কেননা এটা নির্মাণ করা আমাদের জন্যে চ্যালেঞ্জ। এখন অনেকেই কাজটি খুবই সহজ মনে করছে কিন্তু আমাদের এখনও অনেক পথ পাড়ি দেওয়া বাকি রয়েছে। আদতে সব কথার শেষ কথা একুশ উদযাপন হতে পারে উদযাপন কমিটির মাধ্যমে বা অন্যকোনো ব্যানারে তবে আইএমএলডি এটি কোনোভাবেই দায়িত্ব নিবে না।

সুখবর: *নির্মাণ কাজ শেষে এই মিনারের অভিভাবকত্ব কে করবে?*

রিজওয়ান: এর মালিক থাকবে সিটি। তখন এখানে কোনো কিছু করতে গেলে অবশ্য সিটির অনুমতি নিয়ে করতে হবে। সঙ্গত কারণেই মিনার তৈরির পরে এটি সিটির কাছে হস্তান্তর করা হবে।

সুখবর: *আমাদের জানা মতে এখন শহীদ মিনার তৈরিতে ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের নকশা অনুসরণ করে কাজ হচ্ছে। শুরু থেকেই কি এমনটি ছিল?*

রিজওয়ান: এটা খুব স্পর্শকাতর বিষয়। আমি এ বিষয় নিয়ে পরিষ্কারভাবে কিছু কথা বলতে চাই। প্রথমে আমরা যখন প্রজেক্ট শুরু করি তখন আমাদের একটা নকশার প্রতিযোগীতা হয়। কেননা সিটির আইনে বলা আছে আমরা যদি কোনো শিল্পকর্ম করতে চাই তাহলে এটি একটি স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে করতে হবে। এ জন্যে প্রথমে একটি ইনভাইটেশন জানাতে হবে সকলকে ডিজাইন সাবমিশনের জন্যে। যারাই এতে অংশ নিতে চায় তাদেরকে সুযোগ দিতে হবে। এর পর একটি স্বচ্ছ বাছাই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নকশা চূড়ান্ত করতে হবে। শুরুতে আমরা চেয়েছিলাম একটি ইউনিক কিছু করার জন্যে। সেক্ষেত্রে হুবহু ঢাকার শহীদ মিনারের রেপ্লিকা নাও হতে পারে। এসব নিয়ে আমরা যখন কাজ শুরু করি, সে সময়ের ভিডিও ডকুমেন্টেশন রয়েছে। সে সময় আমরা বিশ্বব্যাপি একটি সার্কুলার দিই। এতে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের শিল্পীরা তাদের ডিজাইন আমাদের কাছে পাঠান। আমরা ৫-৬টা

shukhobor-february-2020.indd 43 2020-02-19 2:42 AM

ডিজাইন পাই। তাতে দেশি শিল্পীদের পাশাপাশি বিদেশিরাও অংশ নেন। এর পর আমরা তা প্রর্দশনীর ব্যবস্থা করি। ড্যানফোর্থের এক্সসেস পয়েন্টে সাতদিন ধরে প্রদর্শনী চলে। সেখানে দর্শনার্থীরা ডিজাইনগুলো দেখে তাদের ভোট দেন। সে সময়ে এই এলাকার এমপিপি অর্থার পটস, কাউন্সিলর সকলেই তাদের রায় জানান ব্যালটের মাধ্যমে। ভোট শেষে একটি ডিজাইন নিরঙ্কুষ মেজরিটি পায়। সেই নকশাটির ডিজাইনার ছিলেন মুনির হোসেন বাবু। এর পর আমরা আরও পাবলিক কনসালপেশন করি। তখন ধীরে ধীরে বুঝতে পারি মানুষের দাবিটা হচ্ছে ইউনিক চাই না রেপ্লিকাটা চাই। তখন আমরা জাতীয় শহীদ মিনারের রেপ্লিকার দিকে মুভ করি। সে কারণে আমি বলতে চাই এখন যে শহীদ মিনারটি হচ্ছে সেটি হল বাংলাদেশের জাতীয় শহীদ মিনারের হুবহু নকশা মেনে টরন্টোতে শহীদ মিনার তৈরি হচ্ছে।

সুখবর: *কবে নাগাদ শহীদ মিনারের নির্মাণ কাজ শুরু হবে বলে আপনি মনে করছেন?*

রিজওয়ান: আমি খুবই আশাবাদী যে আসছে সামারে এর কাজ শুরু হয়ে শেষও হয়ে যাবে। পরের একুশে ফেব্রুয়ারির উদযাপন স্থায়ী শহীদ মিনারে করা যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

সুখবর: *শহীদ মিনারের জন্যে কি কোনো স্থান সিটি নির্ধারণ করে দিয়েছে?*

রিজওয়ান: হ্যাঁ, এটা ঠিক হয়েছে। সিটি স্থানটিকে সার্ভেও করেছে এরই মধ্যে। শহীদ মিনারটি হচ্ছে ডেনটোনিয়া পার্কে ভিতরে। বাচ্চাদের খেলার জায়গার ঠিক বাঁ পাশে একটি জায়গা নির্ধারণ করা হয়েছে এরই মধ্যে।

একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মিস্টার রিজওয়ান

রিজওয়ান-ডলি বেগম দম্পতি

সুখবর: *তাহলে কি ঢাকার শহীদ মিনারের বিশাল যে বেইসটা আছে সেটিও কি এখানে তৈরি করা হবে?*

রিজওয়ান: এখানে এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ। কেননা সিটির নিয়ম অনুযায়ি (ব্লিডিং রেগুলেশনস মতে) ভূগর্ভস্থ পানির প্রবাহকে বাঁধা দেয় এমন কোনো স্থাপনা নির্মাণ করা যায় না। বিশেষ করে পার্ক ও অন্যান্য জায়গায়। এটা আমরা এখনও নিশ্চত নই। আমি বলছি না যে হবে না। তবে যদি সলিড কংক্রিটের বেস তৈরি করা না যায় তাহলে আমরা যেটা করব তা হল ব্রিক ইন্টারলক দিয়ে বেইস তৈরি করব। তাহলে পানির প্রবাহ আর কোনো বাঁধা পাবে না। আবার মিনারটিও তার নিজের উচ্চতা নিয়ে দাড়াতে পারবে।

সুখবর: *আপনাদের কাজ এখন কোন পর্যায়ে?*

রিজওয়ান: এখন পর্যন্ত আমাদের যে বাজেট তার ৭০ভাগ অর্থ সংগ্রহ করতে পেরেছি। এখানে বলে রাখি নির্মাণ কাজ পরিচালনার জন্যে আমরা একটি টিম তৈরি করেছি। এই টিমটি পুরো বাজেট নিয়ে রিভিশনে বসবে। যা থেকে একটি চূড়ান্ত এস্টিমেট হবে। সেই এস্টিমেট হওয়ার পর এমনও হতে পারে আগের তুলনায় আমাদের খরচ অনেক কমও হতে পারে। সে মতে আমাদের প্রোগ্রেস অনেক বেড়ে যাবে। কিন্তু এখন আমাদের বাজেট ও সংগৃহীত অর্থ তুলনা করলে যা দাড়ায় তাতে আমাদের কাছে মোট এস্টিমেটের ৭০ভাগ টাকা আছে।

সুখবর: *আমাদের সময় দেওয়ার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।*

রিজওয়ান: সুখবরকেও ধন্যবাদ এই জন্যে যে আমাদের কাজ নিয়ে অনেকেরই বিভিন্ন ধরনের অভিমত ও ভ্রান্তি রয়েছে। সে দিক থেকে প্রথম বারের মতো কোনো মিডিয়ায় শহীদ মিনার নিয়ে বিস্তারিত কথা বলছি। এখানে আমি সাধারণের জন্যে পরিষ্কার বলতে চাই- আমাদের এই যে উদ্যোগ এটিই প্রথম নয়। এর আগেই বহু মানুষ টরন্টোতে শহীদ মিনার নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছেন, অনেকে এর খুব কাছাকাছি গিয়ে থেমে গেছেন পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে। আমরা সেই ধারাবাহিকতাকে বহন করে এনেছি মাত্র। এটি যখন তৈরি হয়ে যাবে তখন বলা যাবে যে এটি হল কানাডায় স্থায়ীভাবে নির্মিত প্রথম শহীদ মিনার তার আগে নয়। কিন্তু এটিই প্রথম উদ্যোগ নয়। শেষ ত্রিশ বছর বিভিন্ন জন বিভিন্ন সময় এই উদ্যোগটি নিয়েছেন। আর দ্বিতীয়টি হল- এটি হবে দেশের জাতীয় শহীদ মিনারের হুবহু রেপ্লিকা। সুতরাং এর একক কোনো নকশাকার নেই। আর তৃতীয় বিষয়টি হল অর্থনৈতিক। কোনো সরকার এর জন্যে কোনো অর্থ সহযোগীতা করেনি। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারের কন্ট্রিবিউশন শূন্য ডলার। এটা আমি পরিষ্কার করছি এই কারণে যে, অনেকেই মনে করেন সরকার আমাদেরকে টাকা দিচ্ছেন তা দিয়ে এটি তৈরি হবে। আদতে এমন কোনো ঘটনা এখনও ঘটেনি।

shukhobor-february-2020.indd 44 2020-02-19 2:42 AM

প্রতি মাসের খবর

ধর্ম

ইসলামে মাতৃভাষার গুরুত্ব

॥ শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী ॥

জগতের সবকিছুই আল্লাহর সৃষ্টি ও অকৃপণ দান। ভাষাও এর ব্যতিক্রম নয়। ভাষা আল্লাহর দান, আল্লাহ তাআলার সেরা নেয়ামত; ভাষা মনুষ্য পরিচয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইসলাম সব ভাষাকে সম্মান করতে শেখায়; কারণ, সব ভাষাই আল্লাহর দান ও তাঁর কুদরতের নিদর্শন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।' (সূরা-৩০ রুম, আয়াত: ২২, ২১; পারা: ২১)।

সব মানুষ একই পিতামাতার সন্তান। সবারই পিতা আদম (আ.), সবারই মাতা হাওয়া (আ.)। তাই সব মানুষ ভাই ভাই, তাদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নাই। সাদা-কালো, লম্বা-খাটো সে তো আল্লাহর সৃষ্টি। বর্ণবৈষম্য, ভাষাবৈষম্য এবং ভৌগোলিক ও নৃতাত্ত্বিক পার্থক্য মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ সৃষ্টি করে না। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন: 'হে মানুষ! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অন্যের সঙ্গে পরিচিত হতে পারো। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তিই বেশি মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকি। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন, সব খবর রাখেন।' (সূরা-৪৯ হুজুরাত, আয়াত: ১৩, পারা: ২৬)।

বিদায় হজের ভাষণে মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, 'কালোর ওপর সাদার প্রাধান্য নেই, অনারবের ওপর আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই।' (বুখারি শরিফ)। সুতরাং কোনো ভাষাকে হেয় জ্ঞান করা যাবে না, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা যাবে না এবং অবহেলা করা যাবে না; কেননা, ভাষার স্রষ্টাও মহান আল্লাহ। তাঁর সৃষ্টির অবমূল্যায়ন করা তাঁর প্রতি অসম্মান প্রদর্শনেরই নামান্তর। আল্লাহ তাআলা মানুষের হিদায়াতের জন্য নবী-রাসুলদের পাঠিয়েছেন। তাঁদের ধর্ম প্রচারের প্রধান মাধ্যম ছিল দাওয়াত বা মহা সত্যের প্রতি আহ্বান। আর এর জন্য ভাষার কোনো বিকল্প ছিল না। আল্লাহ তাআলা বলেন: 'আমি প্রত্যেক রাসুলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি তাদের কাছে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য।' (সূরা-১৪ ইবরাহিম, আয়াত: ৪, পারা: ১৩)।

মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, 'তিন কারণে তোমরা আরবিকে ভালোবেসো; যেহেতু আমি আরবি ভাষায় কথা বলি, কোরআন আরবি ভাষায় লেখা এবং জান্নাতের ভাষাও হবে আরবি।' (বুখারি)। কিন্তু আরবি পরকালের ভাষা হওয়া সত্ত্বেও সব নবী-রাসুল আরবি ভাষাভাষী ছিলেন না; এমনকি সব আসমানি কিতাবও আরবি ভাষায় লেখা হয়নি। আমরা জানি, তাওরাত কিতাব ইবরানি ভাষায় হজরত মুসা (আ.)-এর ওপর নাজিল করা হয়; জাবুর কিতাব ইউনানি ভাষায় হজরত দাউদ (আ.)-এর ওপর নাজিল করা হয়; ইঞ্জিল কিতাব সুরিয়ানি ভাষায় হজরত ঈসা (আ.)-এর ওপর নাজিল করা হয়; এবং সর্বশেষ আসমানি কিতাব কোরআন আরবি ভাষায় সর্বশেষ নবী ও রাসুল মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর নাজিল করা হয়।

সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আল কোরআন আরবি ভাষায় নাজিল করার কারণ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা স্বয়ং ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, 'ইহা আমি অবতীর্ণ করেছি আরবি ভাষায়, যাতে তোমরা বুঝতে পারো।' (সূরা-১২ ইউসুফ, আয়াত: ২, পারা: ১২)। অর্থাৎ আরবদের কাছে আরবি ভাষাভাষীর নবী ও আরবি কিতাব আল কোরআন নাজিল করা হয়েছে। কারণ, তাদের মাতৃভাষা আরবি; অনারবি ভাষায় নাজিল করলে তাদের বুঝতে ও অনুসরণ করতে সহজ হবে না।

ইসলাম শুধু ঐতিহ্য রক্ষার স্বার্থে ব্যাপক জাতীয় কল্যাণ বাধাগ্রস্ত হতে দেয়নি। বরং যাযাবর আরবদের স্থানীয় ভাষায় কোরআন নাজিল করে বিশ্বকল্যাণ নিশ্চিত করা হয়েছে।

ধর্ম প্রচারে শুদ্ধ ভাষা ও সুন্দর বর্ণনার প্রভাব অনস্বীকার্য। আমাদের প্রিয় রাসুল হজরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন 'আফছাহুল আরব' তথা আরবের শ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধভাষী। তাই বিশুদ্ধ মাতৃভাষায় কথা বলা নবীজি (সা.)-এর সুন্নত। নবী করিম (সা.) বলেন, 'ওয়া ইন্না মিনাল বায়ানি লা ছিহরুন'। অর্থাৎ কিছু বর্ণনায় রয়েছে জাদুর ছোঁয়া। আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইলের হিদায়াতের জন্য হজরত মুসা (আ.)–এর প্রতি ওহি নাজিল করলেন; তাঁকে নবী ও রাসুল হিসেবে ঘোষণা করলেন; তাঁর ওপর তাওরাত কিতাব অবতীর্ণ করলেন। তখন তিনি তাঁর ভাই হজরত হারুন (আ.)-কে নবী ও রাসুল হিসেবে ঘোষণা করার জন্য আল্লাহর সমীপে আবেদন আরজ করলেন। কারণ তিনি ছিলেন বাগ্মী, শুদ্ধ ও স্পষ্টভাষী এবং সুবক্তা, আর মুসা (আ.)-এর মুখে ছিল জড়তা। মুসা (আ.) কারণ হিসেবেও বলেছেন, 'হুয়া আফছাহু মিন্নি।' অর্থাৎ সে আমার অপেক্ষা বাকপটু। পবিত্র কোরআনে এই বর্ণনাটি এভাবে উপস্থাপিত হয়েছে: মুসা (আ.) বললেন, "হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন এবং আমার কর্ম সহজ করে দিন। আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। আমার জন্য দিন একজন সাহায্যকারী আমার স্বজনদের মধ্য হতে; আমার ভাই হারুনকে; তাঁর দ্বারা আমার শক্তি সুদৃঢ় করুন এবং তাঁকে আমার কর্মের অংশীদার করুন, যাতে আমরা আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারি প্রচুর; এবং আপনাকে স্মরণ করতে পারি অধিক; আপনি তো আমাদের সম্যক দ্রষ্টা।' (সূরা-২০ তহা, আয়াত: ২৫-৩৬, পারা: ১৬)।

প্রতিটি মুসলমানের ধর্মীয় অনুভূতি ও বিশ্বাসের সঙ্গে স্বাধীনতা, স্বদেশপ্রেম ও মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা বিদ্যমান। এ ক্ষেত্রে ধর্মবিশ্বাসের পার্থক্য কোনো বিভেদ বা বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি করে না। তাই মুসলিম নাগরিকেরা সব সময় মা, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। ইসলাম সব ভাষাকে সম্মান করতে শেখায়। কিন্তু ইসলামের নামে স্বাধীন হওয়া রাষ্ট্র পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী জনমতের বিপরীতে অবস্থান করে, মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করে, ধর্মীয় চেতনার তোয়াক্কা না করে এ দেশের মানুষকে ভিনদেশি ভাষার পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে চায়। কিন্তু এ দেশের জনগণ তা মানতে অস্বীকৃতি জানায়। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য বাক্স্বাধীনতা ও নিজ ভাষায় কথা বলার অধিকারের জন্য প্রাণ দেয় নিরস্ত্র ছাত্র–জনতা। পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র আমরাই মাতৃভাষার জন্য রক্ত ও জীবন দিয়েছি। তাই ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটি আমাদের 'ভাষাশহীদ দিবস' এবং বর্তমানে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালিত হচ্ছে সারা বিশ্বে।

তাই আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, আল্লাহ তাআলা ভাষাশহীদসহ সব শহীদানের শাহাদাত কবুল করুন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে তাঁদের উচ্চমর্যাদায় আসীন করুন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের মাতৃভাষা বাংলা ভাষাকে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী রাখুন এবং কিয়ামত পর্যন্ত উত্তরোত্তর এর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করুন। আমাদের বিশুদ্ধ মাতৃভাষার ব্যবহার ও এর মাধ্যমে সত্য ও ন্যায়ের প্রতি দাওয়াতের তৌফিক দান করুন।

যুগ্ম মহাসচিব, বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি
সহকারী অধ্যাপক: আছ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সুফিজম।

shukhobor-february-2020.indd 45 2020-02-19 2:42 AM

প্রতি মাসের রাশিফল সুখবর

ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসের রাশিফল

॥ ফজলে আজিম ॥

জ্যোতিষশাস্ত্র আর ভাগ্য জানার বিদ্যা এক নয়। ভাগ্য গড়ে নেওয়ার বিষয়। আপনি যদি আপনার সক্ষমতা ও দুর্বলতা জানতে পারেন তবে সহজেই একই ভুলের বৃত্তে বারবার ঘুরপাক থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন। আপনার জীবন হয়ে উঠবে জটিলতামুক্ত, সহজ ও আনন্দময়।

সাফল্য লাভের জন্য শুধু কর্মই যথেষ্ট নয়। দরকার সঠিক কর্মকৌশল, সহনশীলতা ও কিছু বিষয়ে সচেতনতা। আর তাতেই আপনি আপনার জীবনের প্রতিটি যুক্তিসঙ্গত চাওয়াকে পাওয়ায় রূপান্তর করতে পারেন।

পাশ্চাত্য রাশিচক্রমতে চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহগত অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন রাশির জাতক জাতিকাদের নানান বিষয়ের শুভাশুভ পূর্বাভাস ও সতর্কতা জানাচ্ছেন বাংলাদেশ অ্যাস্ট্রলজার্স সোসাইটি (বিএএস)'র কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সদস্য ***অ্যাস্ট্রলজার অ্যান্ড সাইকিক কনসালটেন্ট ফজলে আজিম***।

মেষ রাশি (২১ মার্চ-২০ এপ্রিল): আপনি যদি পেশাগত কোনো পরিবর্তন কিংবা নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে চান তবে সময়টি আপনার জন্য কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। প্রতিটি চ্যালেঞ্জ আপনাকে দেবে নতুন কিছু বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের সুযোগ। আপনার দক্ষতা ও যোগ্যতার জন্য প্রশংসিত হতে পারেন।

বৃষ রাশি (২১ এপ্রিল- ২১ মে) : আপনি যদি সাফল্যের চুড়ায় আরোহন করতে চান তবে সাময়িক কিছু ভালোলাগার পেছনে সময় কম দিতে হবে। আপনার জন্য অপেক্ষা করছে সাফল্যময় আগামী।
সাময়িকভাবে কারো কারও প্রবাস জীবন চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। আর্থিক দিক ভালো যেতে পারে।

মিথুন রাশি (২২ মে- ২১ জুন) : যারা রিয়েল এস্টেট কিংবা স্টক মার্কেটের সাথে জড়িত তাদের সময় মোটামুটি ভালো যেতে পারে। বিবাহিতদের দাম্পত্য সুখ শান্তি বজায় থাকবে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশ্বাস ও সহযোগিতা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সন্দেহ অশান্তির কারণ হতে পারে।

কর্কট রাশি (২২ জুন- ২২ জুলাই) : আপনি যদি ব্যবসায়ী হয়ে থাকেন সময়টা আপনার জন্য মোটামুটি ভালো যেতে পারে। নতুন কোনো সুযোগ আপনি হাতে পেতে পারেন। বিবাহিতদের দাম্পত্য সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। বিবাহযোগ্য কারো কারও বিয়ের আলোচনা হতে পারে। পার্টনারশিপ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই জেনে বুজে বিনিয়োগ করুন, অন্যথায় ঝুঁকির আশঙ্কা রয়েছে। আপনার প্রয়োজনে বন্ধু কিংবা আপনার সহধর্মিণীর আন্তরিক সহযোগিতা লাভ করতে পারেন।

সিংহ রাশি (২৩ জুলাই- ২৩ আগস্ট) : অপ্রাসঙ্গিক বিষয় বিতর্কে জড়ানো ঠিক হবে না । কারও কারও পেশাগত ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে পারেন। কর্মস্থলে সহকর্মীদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করুন। কারো কারো শরীর সাময়িকভাবে কম ভালো যেতে পারে, প্রয়োজনে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। প্রচলিত আইন কানুন সম্পর্কে সচেতন থাকলে ভালো করবেন। কর সংক্রান্ত কাজে ব্যস্ততা বাড়তে পারে

কন্যা রাশি (২৪ আগস্ট- ২৩ সেপ্টেম্বর) : প্রিয়জনের সঙ্গে আনন্দময় সময় কাটানোর সুযোগ পেতে পারেন। নব দম্পতির সন্তান লাভের চেষ্টায় সাফল্য আসতে পারে। সৃজনশীল কাজের সফলতা পেতে পারেন। আপনার বিশেষ কোনো দক্ষতা জন্য সম্মানিত হতে পারেন। ক্রীড়া কিংবা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ততা বাড়তে পারে।

তুলা রাশি (২৪ সেপ্টেম্বর- ২৩ অক্টোবর) : আপনার মনের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ হতে পারে। কেউ কেউ আবাসন খাতে বিনিয়োগের সুযোগ পেতে পারেন। কারো কারো বাসা পরিবর্তন হতে পারে। মাতৃস্বাস্থ্য ভালো যেতে পারে। কোথাও বেড়াতে যাওয়ার সুযোগ পেতে পারেন। বিশেষ কোনো আলোচনায় আপনার অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ পেতে পারেন।

বৃশ্চিক রাশি (২৪ অক্টোবর- ২২ নভেম্বর) : কাছে কিংবা দূরে কোথাও বেড়াতে যাওয়ার সুযোগ পেতে পারেন। ছোট ভাইবোনের সাফল্যে আনন্দ পেতে পারেন। আপনার সাহসী কোনো পদক্ষেপের জন্য সফলতা পেতে পারেন। বিশেষ কারো সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেতে পারেন। সামাজিক কিংবা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ততা বাড়তে পারে।

ধনু রাশি (২৩ নভেম্বর- ২১ ডিসেম্ব) : আর্থিক কাজে ব্যস্ততা বাড়তে পারে। ব্যবসায়িক ভাবে কেউ কেউ লাভবান হবার সুযোগ পেতে পারেন। গৃহে আত্মীয়-স্বজন আসতে পারে। কারো কারো ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক কিংবা পারিবারিকভাবে নতুন সম্পর্ক তৈরি হতে পারে। সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে অন্যের মন জয় করতে সক্ষম হবেন। সঞ্চয়ের সুযোগ পেতে পারেন।

মকর রাশি (২২ ডিসেম্বর- ২০ জানুয়ারি) : নতুন কোনো কাজে হাত দেওয়া হতে পারে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় ব্যস্ততা বাড়তে পারে। বিবাহযোগ্য কারো কারো বিয়ের আলোচনায় অগ্রগতি হতে পারে। নতুন কোনো পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুযোগ পেতে পারেন। কেনাকাটায় ব্যস্ততা বাড়তে পারে। আপনার বিশেষ কোনো দক্ষতা জন্য প্রশংসিত হতে পারেন।

কুম্ভ রাশি (২১ জানুয়ারি- ১৮ ফেব্রুয়ারি) : ব্যয় বাড়তে পারে। কেউ কেউ সাময়িকভাবে আর্থিক কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারেন। আয় উপার্জন বৃদ্ধির যোগ রয়েছে। কাউকে কোনো প্রতিশ্রুতি দেয়ার আগে অবশ্যই চিন্তা করুন, প্রয়োজনে অভিজ্ঞ কারো কাছ থেকে পরামর্শ নিলে ভালো করবেন। প্রচলিত আইন কানুন সম্পর্কে বাড়তি সতর্কতার প্রয়োজন আছে।

মীন রাশি (১৯ ফেব্রুয়ারি- ২০ মার্চ) : সময় আপনার জন্য বেশ ভালো যেতে পারে। বন্ধু-বান্ধবের মাধ্যমে লাভবান হতে পারেন। গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্য আপনার ভাগ্য উন্নয়নের চাকা ঘুরিয়ে দিতে পারে। সামাজিক কিংবা সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ততা বাড়তে পারে। বড় ভাই বোনের কাছ থেকে প্রয়োজনে আন্তরিক পরামর্শ কিংবা গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা লাভ করতে পারেন।

পরামর্শের জন্য যোগাযোগঃ
fazleazim09@gmail.com অথবা ফোন 6047104215

shukhobor-february-2020.indd 46 2020-02-19 2:42 AM

Victoria
SUPERMARKET

Big Sales. Everyday.

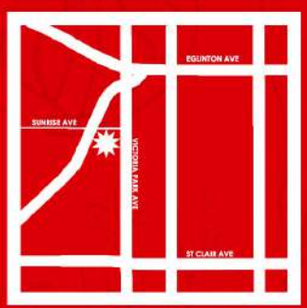

Buy More & Spend Less at Victoria Supermarket. This is the First Bangladeshi Supermarket of this scale. Located at 1400 Victoria Park Ave; we are open 9 am to 10 pm everyday. Get Fresh meat, produce, and daily groceries; and pick up hot food prepared daily ready to go.

Ghoroaa

ঘরোয়া

حلال

Authentic Bangladeshi
cuisine in the heart of
Bangla Town
since 2004

(416) 694-8720

2994 Danforth Ave
East York, ON
M4C 1M7